অন্যান্য

এম সাইদুর রহমান তসলিম*

হগো-পগো

লেখকের কথা ঃ বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে এক দৃশ্যের নাটক বিরল। পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়া এ জাতীয় নাটক মঞ্চস্থ করা দূরুহ। একটানা সংলাপ ক্ষেপণ, বডিলি ও বার্বাল একশান প্রয়োগ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যপার। রাজা হবু মন্ত্রী গবু'র সাথে গোপালভাঁড়ের কোন সম্পর্ক নেই– যেমনটি নেই নায়ের সাথে পচুর। মধ্যস্বত্ব ভোগীদের ষড়যন্ত্রে রাজার পরিবর্তন ঘটলেও হাজার বছর ধরে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কার্যক্রম প্রবাহমান। এ দুষ্ট কীটদের প্ররোচনায়, তোষামদে বিভ্রান্ত হয়ে শাসক হয় ক্ষমতাচ্যুত। নাটকটি মূলত হাস্য-রসের আড়ালে চলমান সংকট নিয়ে রচিত। আশা করছি ভাল লাগবে পাঠকের।

প্রথম দৃশ্য

(রাজা হবুচন্দ্র, মন্ত্রী গবুচন্দ্র, নায়েব পচুচন্দ্র, গোপালভাড় ও ৩ রক্ষী)

হবু ঃ কি হে গোপাল, অমন চুপচাপ বসে আছ কেন ! তোমার দুটো কথা শুনেইতো প্রতিদিন শাসন কার্যে হাত দেই। দেখছোনা সবাই কেমন ঘুমুচ্ছে – তাদেরকে জাগাও।

গোপাল ঃ না রাজা মশাই, আজ আমার মন ভাল নেই।

হবু ঃ একি শোনালে গোপাল! তোমার মন ভাল নেই কেন? তোমার মনে যদি অসুখ বাসা বাধে তবেতো জগৎ অসহায়। এই রাজ দরবারতো একেবারে অচল। মন্ত্রী গবু, নায়েব পচু- শোন তোমরা গোপালের কথা। আজ গোপালের মন ভাল নেই (হাসি)। "তোমার মন ভাল নেই" এই স্তবক দিয়েই শুরু কর আজকের সভা।

গোপাল ঃ আমার কেন মন ভাল নেই সেই কথা আমায় বলতে বাধ্য করবেন না রাজা মশাই। আমি সেই কথা বলতে পারবোনা।

পচু ঃ ন্যাকামি। ঢং না করে বল কেন আজ তোমার মন ভাল নেই।

গবু ঃ হ্যাঁ, নায়েবের সাথে আমি একমত। ভনিতা না করে সরাসরি বলে ফেল কেন তোমার মন ভাল নেই।

---

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

গোপাল ঃ বেয়াদবি নেবেন না মন্ত্রী মশায়। আপনি ও রাজা মশায় যদি আমাকে অভয় দেন তবেই কেবল বলতে পারি আমার মন ভাল না থাকার কথা।

হবু ঃ নিশ্চয়ই, আমি তোমাকে অভয় দিলাম। এবার বল তোমার কথা।

গোপাল ঃ একাদশী শেষে চান করে খেয়ে দেয়ে কাল যখন ঘুমুতে গেলাম, আর ঘুম আসছেনা– আসছেনা।

পচু ঃ তারপর!

গোপাল ঃ তারপর! তারপর অনেক কষ্ট করে চোখ বুজে রইলাম।

হবু ঃ তারপর!

গোপাল ঃ তারপর! জানেন রাজা মশাই, তারপর কখন জানি ঘুমিয়ে পড়লাম।

গবু ঃ এটাই তোমার কাহিনী? চোখ বন্ধ করলেতো সবাই-ই ঘুমিয়ে পড়ে– যত্তসব।

পচু ঃ রাজা বাহাদুর দেখেছেন তার দৃষ্ঠতা? সে ঘুমের কথা বলতে গিয়ে আমাদের কেমন মদন বানিয়ে ছাড়ল। এর একটা বিহিত করুন রাজা বাহাদুর।

হবু ঃ তোমার এই নিরস ঘুমের কথা শোনাতে আমাদের বসিয়ে রেখেছ গোপাল? আমি এইসব শুনতে চাইনা, চাই আরো ভালো কিছু। যাতে আমার মনের খোরাক হয়।

গোপাল ঃ বেয়াদবী নেবেন না রাজা মশাই। আমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি।

গবু ঃ আমি জানতুম, গোপালের কথা শেষ হয়নি। কারণ, আমাদের পেটে খিল না ধরিয়ে গোপাল শেষই করতে পারে না।

পচু ঃ তোমার কথা শেষ কর দেখি একটু হাসতে পারি কিনা।

গোপাল ঃ আমি ঘুমিয়ে গেলাম। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে দেখি, এক মুনিঋষি আমার পৌথানে বসে আছে। হাতে তার লম্বা এক তরবারী। সে আমাকে বলল, সে আমাকে বলল–

গবু ঃ কি বলল?

গোপাল ঃ আমি বলতে পারবো না হুজুর।

গবু ঃ বললেই হলো! তোমাকে বলতেই হবে সে কথা। শত হোক মুনিঋষি বলে কথা। মুনিঋষির কথা শুনতে আমরা সকল শর্ত মেনে নিতে রাজি আছি।

গোপাল ঃ রাজা বাহাদুর কি বলেন?

হবু ঃ গবুর কথায় একমত আমি। তোমার সকল শর্ত মেনে নেয়া হলো।

গোপাল ঃ মুনিঋষি ধমক দিয়ে বলল, তুই আর রাজ দরবারে যাবিনা।

পচু ঃ কেন? রাজ দরবারে আসতে বারণ করলো কেন?

গোপাল ঃ সে কথা মনে হলেইতো আমার কল্‌জে ছোট হয়ে যায়। আমি সেই কথা বলতে পারবো না রাজা বাহাদুর।

হবু ঃ কেঁদোনা গোপাল কেঁদোনা। যত কষ্টেরই হোক না কেন তুমি সব খুলে বলো। কল্‌জে শুকাবার কোন কারণ নেই। আমি অভয় দিলাম, তোমার কোন দণ্ড হবেনা।

গবু ঃ আমিতো আগেই বলেছি গোপাল, তোমার কথার জন্য তোমার সকল শর্ত মেনে নেয়া হলো। তা হলে আর ভয় কিসের।

গোপাল ঃ ঠিক বলেছেন মন্ত্রী বাহাদুর? আমার কোন দণ্ড হবে নাতো?

পচু ঃ কতবার বলতে হয় এক কথা। বল, তারপর কি বললো।

গোপাল ঃ তারপর বললো, রাজ দরবারের সভাসদ বিশেষ করে রাজা বাহাদুর, মন্ত্রী বাহাদুর আর নায়েব মশাই পচু এই তিনজন লোক নাকি বেশি ভালো না।

হবু গবু পচু একসাথে ঃ কি বলছ এসব?

গোপাল ঃ আমি কিন্তু শর্ত দিয়েছি।

হবু ঃ ও শর্ত। ঠিকআছে তারপর বলো।

গোপাল ঃ তারপর এক এক করে বয়ান শুরু করলো- কার নামের কি অর্থ।

গবু ঃ তা কি অর্থ বললো?

গোপাল ঃ প্রথমে বললো পচু নায়েবের কথা।

পচু ঃ নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু বলেনি। তাইনা গোপাল!

গোপাল ঃ খারাপ কি ভালো তা আমি জানিনে। মুনিঋষি বললো- বললো- বলবো হুজুর?

হবু ঃ অবশ্যই বলবে।

গোপাল ঃ গম্ভীর হয়ে চোখ পাকিয়ে বললো, ওহে গোপাল। ঐ যে তোদের নায়েব, তার নামতো পচু। তাইনা? তুই কি জানিস্ , তার নাম ঈশ্বর প্রদত্ত। তুই দশবার রামনাম জপ। আমি দশবার রামনাম জপলাম। আপনারাও জপুন (সবাই জপবে)। যখন জপ বন্ধ হলো তখন ঋষি বললো, ঐ যে পচু তার নামের অর্থ হলো-অর্থ হলো-বলবো হুজুর?

হবু গবু পচু একসাথে ঃ অবশ্যই বলবে। আমরাও দশবার রামনাম জপেছি।

গোপাল ঃ বললো, পচু হলো– ‘প’তে পয়সা আর ‘চু’তে চুর। তার মানে হলো নায়েব মশাই পয়সা চোর।

পচু ঃ সাবধান গোপাল। হুজুর, এর একটা বিহিত করতেই হবে।

হবু গবু ঃ গোপন হাসি থেকে অট্টহাসি।

হবু ঃ তাইতো তুমি গোপাল। দেখলে গবু, স্বপ্নের মাঝেও গোপাল হাসির খোরাক যোগায়।

পচু ঃ আমি এসব বিশ্বাস করিনে। নিশ্চয়ই এটা গোাপলের চাল।

গবু ঃ থামোতো নায়েব, আর কি বললো ঐ ঋষি। খুলে বলো গোপাল।

গোপাল ঃ বলেছেতো অনেক কিছুই। তবে একটা সতর্ক বাণীও রয়েছে। এটা বললো সবার পর।

হবু ঃ খুব আনন্দদায়ক ঘটনার আচ করছি আমি। ভালো করে বসে নেই। গোপাল শুরু কর তুমি।

গোপাল ঃ তারপর ঋষি বললো, ঐযে তোর মন্ত্রী বাহাদুর গবুচন্দ্র। তার নামের অর্থ জানিস্? আমি বললাম, জানিনেতো! তুমিই বলো বাবা। আবার রামনাম জপের পর বললো, ঐ ব্যাটা গবু তার ছোট বেলায় গরুর দুধ খুব পছন্দ করতো।

গবু ঃ একদম সত্যি কথা। আমিতো এখনও গরুর দুধ ছাড়া খাবার কল্পনাই করতে পারি না। একদম খাটি কথা। আমি বুঝতে পারছি রাজা বাহাদুর, ঋষি কি বলেছে।

হবু ঃ কি বলেছে?

গবু ঃ ঋষি নিশ্চয়ই বলেছে ছোট বেলার সেই ঘটনাটা। একদিন দুধের ননী চুরি করে খেয়েছিলাম। পরেতো পেট ফেঁপে গামলা। কি যে কষ্ট হয়েছিল সেদিন। উ-ফ- -। সেই কথাই বলেছে ,তাই না গোপাল?

গোপাল ঃ না তো? এটাতো বলেনি যে আপনি ছোট বেলা চোর ছিলেন।

গবু ঃ সাবধান গোপাল। (হবু ও পচু চোরা হাসবে)

গোপাল ঃ না। বলছিলাম, মুনিঋষি এ তথ্যটি দেয়নি যে আপনি বাল্যকালে গরুর দুধ চুরি করে খেতেন।

গবু ঃ আসল কথা বল। আমার সম্পর্কে ঋষি বাবা কি কথা বলেছে?

গোপাল ঃ বলেছেতো অনেক কিছুই। তবে সার কথা হলো, আপনি যখন চার মাসের শিশু তখনই আপনার বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আপনি মায়ের দুধের বদলে গরুর দুধের ভক্ত ছিলেন। এবং তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন–

হবু ঃ সিদ্ধান্ত! কিসের সিদ্ধান্ত?

গবু ঃ হ্যাঁ, সিদ্ধান্তের কথা বলো।

গোপাল ঃ সিদ্ধান্ত হলো এই যে, আপনার ভাবসাব ভালো না দেখে–

গবু ঃ ভাবসাব! কি ভাবসাব ছিল আমার?

গোপাল ঃ ভাবসাব মানে হলো, আপনার কান্নার সুর নাকি ছিল অন্য ধরনের। মানে মানুষের মতো না কেঁদে আপনি হাম্বা হাম্বা করতেন। যখনই গরুর দুধের বাটি আপনার সামনে দেয়া হতো তখনই একদম চুপচাপ। শুধু তাই নয়, চতুষ্পদ প্রাণীর মতো আপনি চপ্‌চপ্‌ করে এক টানে সে দুধ সাবার করতেন।

পচু ঃ অবাক কাণ্ডতো রাজা বাহাদুর!

গবু ঃ তুমি চুপ করো। পরে বলো।

গোপাল ঃ আপনার এ গো প্রীতি দেখে ঠিক করলেন আপনার নাম রাখবেন গরু।

গবু ঃ খবরদার নাফরমান।

হবু ঃ তুমি চুপ করো গবুচন্দ্র। তুমি কি ভুলে গেছ শর্তের কথা?

গবু ঃ আমায় মার্জনা করুন মহারাজা তারপর বলো গোপাল।

গোপাল ঃ বাবা বললেন গরু। আর আপনার মা বললেন গরু হবে কেন-সেতো ছোট তাই তার নাম দাও বাছুর – না গরু – না বাছুর – না গরু – না বাছুর। এমন তর্ক শুরু হলে আপনার দাদা মশায় এসে সাব্যস্তকরলেন, গরুও না বাছুরও না নাম হবে গবু। অর্থাৎ বাছুর বড় হলেই গরু হয়। সবাই যদি গরু গরু বলে তবে শুনতে জানি কেমন লাগবে। তাই গরুর ব'শুন্য রয়ের ফোটা তুলে নাম রাখা হলো গবু। বুঝলেন এবার।

(হবু ও পচু হাসবে, গম্ভীর গবু)

হবু ঃ চমৎকার যুক্তি। গোপাল, আজ থেকে নায়েবকে পয়সা চোর আর মন্ত্রীকে গরু বলে ডাকবো। কেমন হবে বলো (হাসি)।

গোপাল ঃ ভালো হবেনা রাজা বাহাদুর।

হবু ঃ কেন?

গোপাল ঃ আপনি তাদেরকে পয়সা চোর আর গরু বলে ডাকলে রাজ্যে প্রচার হয়ে যাবে সে কথা।

হবু ঃ সবাই প্রাণ খুলে হাসবে নায়েবকে দেখে। বলবে, ঔ দেখ পয়সা চোর যায়। মন্ত্রীকে দেখে বলবে, ঔ দেখ গরু যায়। (হাসি)

গোপাল ঃ সাথে কিন্তু ওটাও বলবে, ঔ দেখ হদ্দ বোকা রাজা যায়। (হাসি)

হবু ঃ হদ্দ বোকা মানে?

গোপাল ঃ আপনার কথাতো বলাই হয়নি।

গবু পচু একসাথে ঃ রাজা বাহাদুরের কথা তাড়াতাড়ি বল গোপাল।

গোপাল ঃ মুনিঋষির মতে, রাজা বাহাদুর যখন ছোট তখন আবিষ্কার হলো রাজা বাহাদুর একদম বোকা। যাকে বলে একেবারে গাধা।

হবু ঃ গো-পা-ল (সবাই ভয় পেয়ে কেঁপে উঠবে)।

গোপাল ঃ আমি কিন্তু শর্ত দিয়েছি।

হবু ঃ ও শর্ত –

গোপাল ঃ তখন ঠিক হলো, রাজা বাহাদুরের নাম রাখা হবে হদ্দ বোকা। কিন্তু মা বাধ সাধলেন। তিনি বললেন, এটা কেমন শোনায়। এক কাজ কর, এমন নাম রাখ যাতে কেউ না বুঝে। তখন ঠিক হলো, হদ্দের 'হ' আর বোকার 'বু' – মানে নাম রাখা হবে হবু। তাই আপনার নাম হলো হবু। (সকলের হাসি)

হবু ঃ কে আছিস , গোপালকে শুলে চড়া।

প্রহরী ১ ঃ আমি আছি। (এসে গোপালকে ধরবে)

গবু ঃ রাজা বাহাদুর, আমরা কিন্তু শর্ত দিয়েছিলাম যে, গোপালকে কোন দণ্ড দেবনা।

হবু ঃ আমি শর্ত ভঙ্গ করলাম। যা তাকে নিয়ে যা । শুলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড কার্যকর কর।

গোপাল ঃ এতদিন জেনেছি রাজা হবুচন্দ্র কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কিন্তু আজ দেখলাম রাজার অঙ্গিকার ভাঙ্গার দৃশ্য। যাই হউক রাজা বাহাদুর, আপনার আদেশে আমার প্রাণ যদি যায় তবেই আমি ধন্য। তারপরও মৃত্যুর পূর্বে স্বপ্নের শেষ কথাটা বলে যেতে চাই। যদি শেষ কথাটা বলার অনুমতি দেন তবে আমি মরে গিয়েও শান্তি পাব।

হবু ঃ বল তোমার শেষ কথা।

গোপাল ঃ মুনিঋষি চলে যাবার আগে বললেন, এই স্বপ্নের কথা যদি রাজা, মন্ত্রী ও নায়েব জেনে যায় তবে ছয় ঘন্টার মধ্যে গলায় রক্ত উঠে মৃত্যু অনিবার্য।

হবু ঃ কি সর্বনাশের কথা। তবে উপায়? (পচু কাশবে,গবু আতংকিত)

গোপাল ঃ উপায়তো নিশ্চয়ই আছে। থাক, উপায়ের দরকার নেই। আমার যখন প্রাণদণ্ড হবে তখন অন্যের বাঁচা মরা দিয়ে কি করবো আমি। রাজা বাহাদুর, দ্রম্নত আমাকে শুলে চড়ান। আমি আর বাঁচতে চাইনা। আমি মরতে চাই। চিরদিনের জন্য ঘুমাতে চাই। আমায় প্রাণদণ্ড দিন মহারাজ।

হবু ঃ (গলার স্বর নরম করে) কি যে বল গোপাল। আমিত এমনিতেই মস্করা করলাম তোমার সাথে। আমি কখনো শর্ত ভঙ্গ করিনা। এই গোপালকে ছেড়ে দে। এবার উপায়টা বল গোপাল।

পচু ঃ হে ভাই গোপাল, বাঁচার উপায় বলে দাও না দাদা। তোমায় পেট পুরে মোহনভোগ খাওয়াব – আমারত রক্ত বুকে চলে এসেছে।

গবু ঃ হ্যাঁ ভাই, আমার পেটেও মোচর দিয়েছে। কেমন যেন রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। আমাদের বাঁচার উপায়টা বলে দাও ভাই।

হবু ঃ আমারওত কাশি আসছে। মুক্তোর মালা বকশীস দিব। উপায়টা বলে দাও গোপাল।

গোপাল ঃ রাজা বাহাদুর যখন বলেছেন তখন উপায়তো বলতেই হবে। মুনিঋষি বলেছেন, অনিবার্য মৃত্যু ঠেকাতে ঋষিকে ভোগ দিতে হবে।

হবু ঃ ভোগ দিব। নিশ্চয়ই দিব।

গবু ঃ তা কি ভোগ দিতে হবে?

পচু ঃ তারাতারি বল গোপাল। রক্ত বোধহয় গলায় উঠে গেল।

গোপাল ঃ খুবই কঠিন ভোগ। সাতটি কাকাতুয়া, পাঁচটি দাড়িওয়ালা পাঠা, আর সোয়া কেজি বাঘের দুধ। আর এসব আজ সন্ধ্যা বাতির আগেই দিতে হবে।

হবু ঃ কোথায় পাব এসব?

গবু ঃ এবার বোধহয় আর বাঁচলাম না।

পচু ঃ গোপাল কি শোনালে এসব। আমি বোধহয় সরেই গেলাম। ওগো হ্যাদার মা তুমি বিধবা হয়ে গেলে গো। রাজা বাহাদুর, মন্ত্রী মশায় আমায় বিদায় দিন। আমি মরে গেলাম গো (বলেই পড়ে যাবে)।

গোপাল ঃ ভয় পাবেন না রাজা বাহাদুর। ঋষি বিকল্প কথাও বলে গেছে। ভোগ না পেলে সহজ পথও দেখিয়ে গেছেন।

হবু গবু পচু ঃ (খুশিতে একসাথে বলে উঠে) সহজ পথ আছে? আমরা তাহলে বাচঁবো?

গোপাল ঃ অবশ্যই বাচঁবেন।

হবু ঃ এইত ভাল লাগছে।

গবু ঃ বড় আরাম পাচ্ছি।

পচু ঃ হ্যাদার মা, তোমাকে আর বিধবা হতে হবে না।

হবু ঃ তো সহজ পথটা কি বল।

গোপাল ঃ ঋষি বলেছেন, যদি ভোগ না পাওয়া যায় তবে জনপ্রতি পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা করে মোট পনর শত আমার বালিশের নিচে রেখে দিতে হবে। আমি যখন ঘুমাবো মুনিঋষি তখন নিজ দায়িত্বে তা নিয়ে ভোগ কিনে নিবেন।

পচু ঃ পাঁচশ করে পনরশ স্বর্ণ মুদ্রা!

গোপাল ঃ আরো আছে। যদি দর কষাকষি হয় তবে মুদ্রা দ্বিগুণ দিতে হবে।

হবু ঃ সাবধান কথা বাড়িও না।

গবু ঃ স্বর্ণমুদ্রা বড় না জীবন বড়। প্রায়তো মরেই গিয়েছিলাম।

হবু ঃ কথা না বলে পনরশ স্বর্ণমুদ্রা গোপালের হাতে তুলে দাও। গোপাল, তুমি গিয়ে এখনই ঘুমিয়ে পড়। যাও – যাও – (পচু মুদ্রা দিবে। গোপাল খুশিতে তা গ্রহণ করবে। প্রহরীরা চোখাচোখি করবে।)

গোপাল ঃ হবু রাজা কি জয়। গবু মন্ত্রী কি জয়। পচু নায়েব কি জয়। আজ প্রমাণিত হলো আসলেই হবু রাজার কাছে অর্থ কিছুই নয়। মুনিঋষির বাণীই বড়। রাজা মশাই আমি এখন যাই। তারাতারি ভোগ না দিলেতো আবার গলায় রক্ত উঠে যাবে।

হবু ঃ যাও। তারাতারি যাও।

গবু ঃ দ্রুত শুয়ে পড় গিয়ে।

পচু ঃ আর কথা কেন গোপাল। ভোগটা দিয়ে এস।

গোপাল ঃ আমি গেলাম। আদাব – আদাব – আদাব।
(পথ আগলে দাড়াবে প্রহরী)

প্রহরী ২ ঃ সবাইকে বোকা বানালেও আমি কিন্তু সব টের পেয়েছি। সুযোগ সুবিধা না দিলে একেবারে ডাণ্ডিপটাশ করে দিব। মনে থাকে যেন।
গোপাল ঃ আমি জানিত, তোমরা হবু গবু আর পচুর মতো গাধা গরু আর বলদ নও। সময় হলে সাইজ করে দিব।(প্রস্থান)

প্রহরী ২ ঃ মনে থাকে যেন।
(চেচামেচি করতে করতে রাণীর প্রবেশ। সাথে রাজকুমারী)

হবু ঃ একি কাণ্ড! অন্তপুর ছেড়ে তুমি একেবারে রাজ দরবারে?

রাণী ঃ গোস্তাকী মাফ করবেন আলমপনা। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলেইত রাজ দরবারে ছুটে এলাম।

হবু ঃ সহ্যের সীমা! কিসের সহ্য?

রাজকুমারী ঃ কেন আব্বা হুজুর। আপনি কি জানেন না যে মা জননী দাঁতের ব্যথায় কাতর হয়ে আছেন দুইদিন ধরে।

রাণী ঃ হ্যাঁ আলমপনা। দাঁতের ব্যথায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমি আর সহ্য করতে পারছিনা। শাহী হেকিমের ঔষধেও কাজ হচ্ছে না। যে ব্যথা নিয়ে আমি এখনও

বেঁচে আছি তা যদি অন্য কারো হতো তবে এতক্ষণে বিষ পানে আত্মহত্যা করত জাহাপনা। উ-হ্ ।

হবু ঃ আত্মহত্যা! সে কি কথা! গবু, পচু। তোমরা দাঁড়িয়ে দেখছ কি? একটা ব্যবস্থা কর। আমার রাজ্যের হেকিমদের জড়ো কর। বোর্ড বসিয়ে সেবা দাও রাণীর।

গবু ঃ জাঁহাপনা যদি অভয় দেন তবে একটা কথা বলতে পারি।

হবু ঃ নিশ্চয়ই বলবে গবু।

গবু ঃ রাণী মাতার তো দাঁত মাজার কোন সমস্যা নেই। তাইনা ?

রাজকুমারী ঃ তা থাকবে কেন? আম্মিজানতো দুইবেলা জইতুন দিয়ে দাঁত মাজেন।

গবু ঃ যা সন্দেহ করেছিলাম জাঁহাপনা। রাণীমার আক্কেল দাঁত উঠছে। এবার রাণীমার আক্কেল বুদ্ধি হবে।

পচু ঃ আমিওতো তাই বলতে চেয়েছিরাম। রাণীমার আক্কেল হচ্ছে।

গবু ঃ খামোশ না লায়েক। (চুপসে যাবে পচু)

রাণী ঃ আমি আর সহ্য করতে পারছিনা।

রাজকুমারী ঃ আম্মি একটু শান্ত হও। আমি যে তোমার কান্না সহ্য করতে পারছি না।

হবু ঃ আমিওতো সহ্য করতে পারছিনা (চাখ মুছবে হবু)। আচ্ছা, আমারতো কখনো এমন ব্যথা করেনি গবু। এ ব্যথা কেমন লাগে।

গবু ঃ আমি কেমন করে বলবো। আমারওতো কখনো এমন ব্যথা করেনি হুজুর।

পচু ঃ হাসি।

হবু ঃ তুমি হাসছো কেন নায়েব?

পচু ঃ আমি হাসছি এই জন্য যে, আপনাদের দুইজনের একজনেরও আক্কেল দাঁত উঠেনি। (আবার হাসি)

গবু ঃ মানে?

পচু ঃ মানে খুব সহজ। আক্কেল দাঁত যার উঠেনি সে ব্যাক্কেল। (অট্টহাসি)

গবু ঃ কি বলতে চাও তুমি? তার মানে আমরা ব্যাক্কেল।

পচু ঃ আস্তেবলুন হুজুর। লোকজন জেনে যাবে। যদি তারা জানে আমাদের রাজা ও মন্ত্রীর এখনো আক্কেল দাঁতই উঠেনি তবে কাল থেকে কেউ আর আপনাদের মান্য করবেনা।

হবু ঃ তাই নাকি? কেউ কি একথা শুনেছে? (উদ্বেগের সাথে)

গবু ঃ এই প্রহরীরা, তোমরা কি কেউ কিছু শুনেছ?

(প্রহরীরা সবাই একসাথে না সূচক মাথা নাড়াবে)

হবু ঃ বাঁচা গেলো। তা পচু, তোমার কি আক্কেল দাঁত উঠেছে?

পচু ঃ উঠেছে মানে! এক্কেবারে সবগুলো।

হবু ঃ তো কতদিনের ব্যথায় এসব দাঁত উঠেছিল তোমার?

পচু ঃ সে আর বলবেন না জাহাপনা। চারটি আক্কেল দাঁতের চারটি করে কোনা। সর্বমোট ষোলবার ব্যথা উঠেছিল।

হবু ঃ তার মানে রাণীর ষোলবার এমন ব্যথা হবে।

রাণী ঃ ও - মাগো - আমি তাহলে আর বাঁচবোনা গো।

রাজকুমারী ঃ আম্মিজান – আম্মিজান। (প্রহরী ২ কাঁদবে)

হবু ঃ একি হলো। গবু পচু তোমরা কিছু কর (ব্যাকুলভাবে)।

পচু ঃ আমি কি করবো হুজুর?

রাণী ঃ জাঁহাপনা, আপনি বিচলিত হবেন না। আমি অন্তপুরে যাচ্ছি। যদি পারেন শাহজাদী গুলবাহারের কাছে জরুরী দাওয়া পাঠিয়ে দেবেন।

হবু ঃ তুমি ক্লান্ত রাণী। একা যেতে পারবেনা। প্রহরী, রাণীমাকে হেরেমে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর। (প্রহরীর সাথে রাণী চলে যাবে গালে হাত চাপা দিয়ে)

হবু ঃ কি করি এখন বলতো গবু। গোপাল যে কোথায় গেলো। (চিন্তিতভাবে)

পচু ঃ গোপালত এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

হবু ঃ আমার বিপদের সময় গোপাল নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। প্রহরী – যাও, গোপালকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসো। যাও – (প্রহরী ২ ছাড়া সকলের প্রস্থান)

গবু ঃ একি করলেন রাজা বাহাদুর! গোপালত ঘুমিয়ে ভোগ দিবে। নয়ত আমরা –

পচু ঃ মরে যাবো রাজা বাহাদুর।

হবু ঃ তাইতো! আমারতো খেয়ালই ছিলনা।

গবু ঃ হুজুর, আপনার পায়ে পড়ি। আপনি আদেশ প্রত্যাহার করে গোপালকে ঘুমাতে দিন। যাতে ঋষি ভোগ নিতে পারে।

পচু ঃ হ্যাঁ জাঁহাপনা। গোপালকে শান্তিতে ঘুমাতে দিন। আমি বোধহয় মরেই যাচ্ছি। (কাশি)

রাজকুমারী ঃ এসব কি হচ্ছে আব্বাজান! আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনা।

হবু ঃ তোমরা এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? বখশিশ নিতে কেউ কি কখনো দেরী করে? অপেক্ষায় থাকে কখন পাবে। যখনই হাতের কাছে এসে যায় তখনই ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

গবু ঃ কিছুই বুঝলাম না জাহাপনা।

পচু ঃ খুলে বলুন জাহাপনা। আপনার অবিচল আচরণে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। দোহায় আপনার, খুলে বলুন জাহাপনা। (পায়ে পড়বে)

হবু ঃ (পা তুলে চেয়ারে বসবে) আসলে তোমাদের এতদিনেও বুদ্ধি হয়নি। গোপাল দরবার ত্যাগ করেছে চার ঘন্টা আগে। তখন ভর দুপুর। গোপাল ভুড়ি ভোজ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমায় -তাতো জানোই। তো আরো কমপক্ষে দুই ঘন্টা পূর্বেই গোপাল বালিশের তলায় মুদ্রা রেখে ঘুমিয়ে গেছে। ধরে নাও সে ঘুমাবার এক মিনিটের মধ্যেই মুনিঋষি ভোগ নিয়ে গেছে। কারণ, মুনিঋষিতো দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সবই দেখে। তাহলে গোপালের লম্বা ঘুম দিয়ে আমাদের লাভ কি?
গবু পচু একসাথে ঃ হবু রাজা কি জয়। বুদ্ধিমান রাজা দীর্ঘজীবী হোন।
(প্রহরী সহ গোপালের প্রবেশ)

গোপাল ঃ আদাব জাহাপনা।

হবু ঃ একি প্রহরী, চণ্ডীদাস এলোনা ?

প্রহরী ১ ঃ চণ্ডীদাসত আমাদের সনে যায়নি মহারাজ।

পচু ঃ হুজুর, এসব কথা বাদ দিয়ে আগে ভোগের কথা বলুন।

গবু ঃ হ্যাঁ জাঁহাপনা। গোপাল আগে বল, তুমি কি ঘুমিয়েছিলে? ঋষি কি ভোগ নিয়েছে? ঋষি কি বললো?

গোপাল ঃ নিয়েছে মানে –বলতে গেলে ছোঁ মেরেই নিয়ে গেছে। চোখের পাতা লাগার আগেই অনুভব করলাম,অদৃশ্য দু'টি হাত আমার বালিশের তলায় ঢুকল আর বেরুল। আ - র খুব আস্তে একটা কথা শুনতে পেলাম।

হবু গবু পচু একসাথে ঃ কি কথা?

গোপাল ঃ শুনতে পেলাম – হবু, গবু, পচু, আর তুই তিনশ বছর বাঁচবি।

হবু গবু পচু একসাথে ঃ ঋষি বাবা কি জয়।

হবু ঃ বলেছিলাম না গবু, তোমাদের এখনও বুদ্ধি হয়নি। দেখলেতো, আমার কথা কেমন সত্যি হলো।
(হবু, পচু হাসি)

হবু ঃ যা হোক, কি জানি বলছিলাম। ও-হো, চণ্ডীদাস আমার আদেশ অমান্য করেছে। প্রহরীদের আমি আদেশ করেছিলাম গোপালের বাড়ি যেতে। সে আমার আদেশ অমান্য করে রাজ দরবারে দাঁড়িয়ে থেকে দৃষ্ঠতা দেখিয়েছে। তার গর্দান কাটা হোক। প্রহরী, এ নালায়েকের গর্দান কেটে হেরেমের প্রধান ফটকে ঝুলিয়ে দাও।

রাজকুমারী ঃ না – না – না। আব্বা হুজুর, এমন কাজ আপনি করবেন না

হবু ঃ রাজকুমারী, একজন প্রহরীর জন্য তোমার এত উৎকণ্ঠার কারণ কি জানতে পারি?

রাজকুমারী ঃ কারণতো অবশ্যই আছে। আব্বা হুজুর, আমি বলছিলাম কি – মানে –

গোপাল ঃ (সামনে এসে আস্তেআস্তে) রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। শালা চণ্ডীদাসের জন্য যদি ফেঁসে যাই।

হবু ঃ চণ্ডীদাস, আমি এই রাজ দরবারে তোমার গর্দান নেব। কে আছিস, জল্লাদ নিয়ে আয়।

গোপাল ঃ জাঁহাপনা, চণ্ডীদাসের গর্দান এই রাজ দরবারেই হবে। এবং তার মুণ্ডু দিয়ে বল খেলা হবে।

হবু ঃ চমৎকার আইডিয়া।

গোপাল ঃ এর আগে আমি চণ্ডীদাসের সাথে কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করছি জাঁহাপনা।

হবু ঃ অনুমতি দেয়া হলো।

গোপাল ঃ এদিকে আসতো বাবা চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস ঃ হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব। আমার মুণ্ডু দিয়ে বল খেলার আগে তোমার ভুড়ি দিয়ে আমি ডুগডুগি বাজিয়ে ছাড়ব।

গোপাল ঃ আরে ব্যাটা, তোকে বাঁচাতেইতো আমি ফন্দি এটেছি। এখন ঘটনাটা খুলে বল।

চণ্ডীদাস ঃ ঘটনা অতি সাধারণ। আমি রাজকুমারীকে ভালবাসি। রাজকুমারীও আমাকে ভালবাসে।

গোপাল ঃ (মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে) এটাকে সাধারণ বলছিস্ তুই! তোর গর্দান আজ যাবেই যাবে।

চণ্ডীদাস ঃ আমার গর্দান যাবেনা। কারণ, আমার গর্দান যাবার আগে তোমার ভুড়ি যাবে। তাই নিজের ভুড়ি বাঁচাতে তুমিই একটা ব্যবস্থা করবে। (হাসি)

গোপাল ঃ চুপ কর হতচ্ছাড়া। দেখি কিছু একটা করতে পারি কিনা। (রাজার কাছে গিয়ে) জাঁহাপনা, আমি রাজকুমারীর সাথে কথা বলার অনুমতি চাই।

হবু ঃ অনুমতি দেয়া হলো।

গোপাল ঃ (রাজকুমারীর কাছে গিয়ে) রাজকুমারী আপনি একি করলেন?

রাজকুমারী ঃ ঠিকই করেছি। বাঈজীশালায় গিয়ে আপনারা যখন নারী নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করেন তখন মনে থাকেনা তারাও এই রাজকুমারীদের মতই মানুষ। চণ্ডীদাস

সুদর্শন যুবক। আমি তাকে ভালবাসি। তার জন্য আমি জান দিয়ে দিব। আর জান-ই বা দিব কেন। আপনি তো রয়েছেন। আমার পক্ষ থেকে উপঢৌকনও রয়েছে। সকল ব্যবস্থা আপনিই করুন।

গোপাল ঃ তা যা বলেছেন। কোন চিন্তা করবেন না। আমি একটা বিহিত করে দেব–তবে বলুনতো, রাজ দরবারে আপনার আগমনের কারণ কি?

রাজকুমারী ঃ আম্মিজানের আক্কেল দাঁত উঠছে। ব্যথায় কাতর। দাওয়াই নিতে দরবারে এসেছি।

গোপাল ঃ আক্কেল দাঁত! পেয়েছি। পেয়েছি। কোন চিন্তা করবেন না। চণ্ডীদাসের কিছুই হবেনা। তবে –

রাজকুমারী ঃ বুঝতে পেরেছি। এই নিন হিরার অঙ্গুরী।

গোপাল ঃ (রাজার কছে গিয়ে) বিরাট সমস্যা। আপনাকে একটু এদিকে আসতে হবে হুজুর।

হবু ঃ (একটু দূরে সরে এসে) বল গোপাল, কেন আমায় ডেকেছ।

গোপাল ঃ চণ্ডীদাসের গর্দান নেয়া যাবেনা।

হবু ঃ কেন?

গোপাল ঃ তবে ফাঁস হয়ে যাবে রাণীমার আক্কেল দাঁতের কথা।

হবু ঃ হোক।

গোপাল ঃ না। তাহলেত আপনি খোঁজা হয়ে যাবেন।

হবু ঃ তার মানে?

গোপাল ঃ যদি চণ্ডীদাসের গর্দান নেন তখনই শুরু হবে কানাঘুষা। সবাই সন্দেহ করবে। তারপর বেরোবে রাণীমার রাজ দরবারে আসার কথা। দাঁতের ব্যথার কথা। কিন্তু এটাতো হতে দেয়া যাবেনা। কারণ, রাণীমার আক্কেল দাঁত উঠা বন্ধ করতে হবে আগে ।

হবু ঃ কেন?

গোপাল ঃ রাণীমার যদি আক্কেল দাঁত উঠে যায়, তবেত তিনির আক্কেল জ্ঞান বেড়ে যাবে। আপনার চেয়েও বেশি জ্ঞানী হয়ে যাবেন তিনি। তখনতো আর আপনাকে পাত্তাই দিবেন না রাণীমা। দেখবেন, কোন এক ভোরে আপনাকে ফেলে –

হবু ঃ কি সাংঘাতিক কথা! তবে উপায় ?

গোপাল ঃ উপায়ত একটা আছেই। সবে উঠতে শুরু করেছে আক্কেল দাঁত। এখনই ব্যথা বন্ধ করে দিলে দাঁত উঠা বন্ধ। দেখেননি, প্রসব ব্যথা উঠলে প্রসব হয়। আর যদি ব্যথা না উঠে তাহলে প্রসবও নাই।

হবু ঃ তা - ই কর। এক্ষুণি প্রসব বন্ধ করে দাও। না মানে, দাঁত ব্যথা বন্ধ করে দাও। তাড়াতাড়ি দাওয়াই এনে দাও। ওহ্ , আমি পাগল হয়ে যাব। যা করার তাড়াতাড়ি কর। আমি মন্ত্রীর সাথে কথা বলে এক্ষুণি একটা সিদ্ধান্ত নিব।

গোপাল ঃ তা আপনি চিন্তা করবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে নিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জাঁহাপনা। তবে –

হবু ঃ বুঝেছি। এই নাও মুক্তার মালা।

গোপাল ঃ যা বাবা, বাঁচা গেল। শালার চণ্ডীদাস, যা এবার নাকে তেল দিয়ে প্রেম কর।

হবু ঃ প্রহরী। শাহী এলান জারী কর। আজ থেকে এই রাজ্যে কারো আক্কেল দাঁত উঠতে পারবেনা। যদি কারো উঠে তবে তাকে শুলে চড়িয়ে মারা হবে।
(বাইরে চেঁচামেচি)

হবু ঃ কিসের চেঁচামেচি ? প্রহরী, দেখ কি হলো।

প্রহরী ঃ বিচার প্রার্থী এসেছে হুজুর।

গবু ঃ ভিতরে নিয়ে এসো।

পচু ঃ জাঁহাপনা, রাজকুমারীকে রাজ দরবারে বসিয়েই বিচার কাজ করবেন?
গোপাল ঃ ঠিক বলেছেন। চণ্ডীদাস, রাজকুমারীকে অন্তপুরে পৌঁছে দিয়ে এসো।
(চণ্ডীদাসের সাথে রাজকুমারীর প্রস্থান)

(হ্যাবলার মা কাঁদতে কাঁদতে হ্যাবলার বাবাকে নিয়ে প্রবেশ করে)

হ্যাঃমা ঃ হুজুর, সুবিচার করুন। এই হ্যাবলার বাবা প্রতি রাতে মদ খেয়ে এসে আমাকে জুতা দিয়ে পিটায়। আমি আর পারছিনা হুজুর।

হবু ঃ কত্ত বড় সাহস। আমার রাজ্যে জুতা পেটা!

গবু ঃ এটা অন্যায়। পিটাবিত পিটা, হাত দিয়ে না হয় লাঠি দিয়ে। কিন্তু তা না করে এক্কেবারে জুতা দিয়ে। জাঁহাপনা, এর বিচার হওয়া উচিত।

হ্যাঃমা ঃ শুধু তাই নয়, সে প্রতিদিন আমায় হুমকি দিয়া বলে আরেকটা বিয়া করবো।

পচু ঃ হুজুর, এটা কোন সমস্যাই নয়। বিয়ে সাদিতো পুরুষই করবে। কিন্তু জুতা পেটা করা খুব খারাপ কাজ।

হবু ঃ এই ব্যাটা, ওর কথা কি ঠিক?

হ্যাঃ বাবা ঃ হুজুর, একদম মিথ্যা কথা। আমি জুতা পামু কই। আমিত খরম দিয়া পিটাই।
হবু গবু পচু একসাথে ঃ কি ?

হ্যাঃ বাবা ঃ হুজুর, আপনিই বিচার করুন। হের মাথা ভর্তি উকুন। এই উকুন এখন আমার মাথায় বাসা বাধছে। উকুনের জ্বালায় আমি ঘুমাইতে পারিনা। দিনরাত মাথা চুলকাই। আপনিই বলেন হুজুর, এরপরও কি তারে নিয়া ঘর করা যায়?

হবু ঃ জটিল সমস্যা।

গবু ঃ তবু বিধান করতে হবে।

পচু ঃ হুজুর, জুতু-খড়ম দিয়ে মানুষ মারা খুবই খারাপ হুজুর।

গোপাল ঃ হুজুর যাই করুন, বেচারা গরীব মানুষ। তার উপর হাবাগোবা। আর মাল খেলেতো আমাদেরই সুবিধা। কোনদিনও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। বিদ্রোহও করতে পারবে না। এবারের মতো মাফ চাই-য়ে ছেড়ে দিন। আর বউদের একটু না পেটালে সোজা থাকেনা।

হবু ঃ বিধান দিতে হবে। এই ব্যাটা, আরো বউকে খড়ম দিয়ে মারবি? যদি মারিস্ শুলে চড়াব।

হ্যাঃবাবা ঃ না হুজুর, আর কোনদিন এমন করবোনা। আমার প্রাণ নেবেন না।

হবু ঃ (হ্যাবলার মার দিকে ফিরে) শুনেছত নাকি? যদি ভবিষ্যতে তোমাকে আবারো জুতা বা খড়ম দিয়ে পেটায় দরবারে জানাবে। শালার জান নিয়ে নেব। এবার তোমরা যাও। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রহরী, শাহী এলান জারী কর। আজ থেকে কেউ বউকে জুতু বা খড়ম দিয়ে মারতে পারবে না। যদি মারতে হয় তবে লাঠি বা হাত দিয়ে মারবে। (এ-লা-ন)
(যদুর প্রবেশ)

যদু ঃ সুবিচার করুন দয়াবান রাজা। আমাদের প্রতিপালক হিসাবে আপনার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করছি।

পচু ঃ জাঁহাপনা, প্রজা মশায়ের ঢং দেখুন। পট্টি দিতে এসেছে। ফরিয়াদ বয়ান করুন।

যদু ঃ হুজুর, আমার চোখে তাকিয়ে দেখুন, রক্তের নহর বইছে। আমি কলাবাদুর হয়ে গেছি।

গবু ঃ কলা-বাদুর মানে!

যদু ঃ মানে হলো হুজুর, সারারাত জেগে থাকি সারাদিন ঘুমাই।

পচু ঃ হুজুর, এই ব্যাটা চোর।

হবু ঃ ঐ ব্যাটা তুই কলাবাদুর, না? পচুর কথা যদি সত্যি হয় তবে তোকে শুলে চড়াবো।

যদু ঃ হুজুর, আমি জীবনেও চুরি করি নাই।

গবু ঃ তাহলে রাত জাগিস্ কেন?

যদু ঃ পাশের বাড়ির কদম আর তার বউ সারারাত অট্টহাসিতে মশগুল থাকে। আমরা এই পাড়ার লোকজন অনেক চেষ্টা কইরাও তাদের হাসি থামাইতে পারছিনা। তাদের অট্টহাসিতে আমাদের ঘুম হারাম হইয়া গেছে। সারারাত ঘুমাইতে না পাইরা সারাদিন বাদুরের মত ঘুমাই। আর এই দিকে কাজকর্ম বন্ধ হইয়া ছেলে-পুলে নিয়া না খাইয়া মরার উপায় হইছে। আপনি বিচার করুন হুজুর, বিচার করুন।

হবু ঃ তাজ্জব সমস্যা !

পচু ঃ সমস্যা যত তাজ্জবই হোক না কেন রাজা বাহাদুর নিশ্চয়ই সমাধান করবেন।

হবু ঃ হ্যাঁ। এলান জারি কর। আজ থেকে আমার রাজ্যে আর কেউ হাসতে পারবেনা। হাসির শব্দ শোনা মাত্রই তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হবে। অর্থাৎ- হাসি মানেই ফাঁসি। কি, খুশিত যদু ?

যদু ঃ জ্বী হুজুর, আমি খুব খুশি।

হবু ঃ ব্যাটা হাসি বন্ধ কর। প্রহরী, এলান –

গোপাল ঃ হুজুর, এলানের আগে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম।

হবু ঃ না। কোন কথা নয়। আমাকে কঠোর হতে দাও। আমি সু-শাসক হতে চাই। জনগণকে বোঝাতে চাই যে, আমি তাদেরই একজন। এলান দাও –
(অট্টহাসিতে রাজকুমারীর প্রবেশ)

রাজকুমারী ঃ আব্বাজান –

হবু ঃ কি হয়েছে শাহাজাদী গুলবাহার! তুমি এত প্রফুল্ল আজ। ভাবতেই আমার ভাল লাগছে।
রাজকুমারী ঃ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে আজ আব্বাহুজুর। গোপালভাড়ের দাওয়া খেয়ে আম্মিজানতো একদম সুস্থ।

হবু ঃ তাই নাকি !

রাজকুমারী ঃ শুধু কি তাই ! আম্মিজান কিছুক্ষণ আগে এত্তবড় একটা আস্তসুপারী মুখে পুরে যখন কামড় বসিয়েছে, তখন কি কাণ্ডটাই না ঘটল। দাঁতের চাপ সহ্য করতে না পেরে বাবা সুপারী গুলির মতো ছুটে গেল বাদী রহিমার দিকে। এক্কেবারে গিয়ে তার নাকের ডগায়। বাদীতো ভয়ে অজ্ঞান। উপস্থিত সবাইত হেসে খুন। আপনিই বলেন আব্বাহুজুর, এটাকি অদ্ভুত কাণ্ড না ?

হবু ঃ অদ্ভুত মানে ! তোমার কথা শুনে আমার মাঝেওতো হাসি সংক্রমিত হচ্ছে। (হাসি–বাকীরা কাঁদবে) একি ! তোমরা কাঁদছ কেন? বন্ধ কর রসিকতা।

পচু ঃ জানের মায়ায় কাঁদছি হুজুর। আপনিত এলান দিয়েছেন, কারো হাসির শব্দ পাওয়া মাত্রই তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারবেন। তাই না হেসে কাঁদছি ।

গোপাল ঃ জাঁহাপনা, বেয়াদবী না নিলে একটা কথা বলতে চাই-তা হলো, এলান জারির পর রাজকুমারী ও আপনি হাসিতে লুটিপুটি খেয়েছেন। এই ক্ষেত্রে কি বিধান কার্যকর হবে?

রাজকুমারী ঃ ওরা এসব কি বলছে আব্বাজান (কাঁদবে)।

হবু ঃ কি সাংঘাতিক কথা। না-না, এই বিধান পাল্টাতে হবে। কান্না খুব খারাপ জিনিস্। এটা দুঃখ নিয়ে আসে। তোমরা সবাই হাসবে। বিধান উল্টিয়ে কান্নার বদলে হাসি জুড়ে দাও।

গবু ঃ জাঁহাপনা, এতেও কি কোন বিপত্তি হবার সম্ভাবনা রয়েছে? থাকুক, কান্নাকাটি আমারও ভাল লাগে না। এবার শুধু হাসব আর হাসব।
(নেপথ্যে রাণীর কান্নার শব্দ,রাণীর প্রবেশ)

রাণী ঃ আলমপনা। আজ আমার মন ভাল নেই। কতদিন ধরে মা বাবাকে দেখিনা। কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি মা আমার শোকে একদম তালপাতা হয়ে গেছে (আবার কান্না)।

রাজকুমারী ঃ আম্মিজান, আমি আপনার কান্না সহ্য করতে পারিনা – কান্না।

হবু ঃ তোমাদের কান্না দেখে আমারওতো কান্না আসছে।
(সবাই হসবে)

রাণী ঃ আমার এ শোকের সময় সবাই হাসাহাসি করছে কেন? এটা কি মগের মুল্লুক? যার যা খুশি তা-ই করবে। এই নাফরমানদের বিচার করার আগে পর্যন্ত আমি আপনার মুখ দর্শন করবো না। গুলবাহারকে নিয়ে আমি বাপের বাড়ি চললাম।
(গুলবাহারের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে)

রাজকুমারী ঃ আম্মিজান – আব্বাজান (প্রস্থান)

হবু ঃ শোন রাণী শোন। তুমি যেওনা। শোন। একি হলো আমার। আমার গড়া বিধানে আমিই বিদ্ধ হলাম। গবু , পচু, গোপাল – নতুন বিধান বের কর। বি-ধা-ন।

গবু ঃ কি বিধান বের করব, সেই বিধানইত পাচ্ছিনা হুজুর।

পচু ঃ আমাদের মাথায় যখন কিছু ঢুকছেনা তখন গোপালকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

গোপাল ঃ আমার বিধানত আবার কঠিন হয়ে যায়, তাই বলছিলাম –

হবু ঃ কিচ্ছু বলতে হবেনা। তুমি শুধু বিধান বাতলে দাও। আমি জারি করে দেব। তোমার উপর আমার সে বিশ্বাস আছে।

গোপাল ঃ জাঁহাপনা, মাত্র একটা বিধানই আছে, যা এলান করে দিলে এত্ত সমস্যা হবে না।

হবু, গবু, পচু > মাত্র একটা বিধান !

গোপাল ঃ হ্যাঁ জাঁহাপনা। আমি ভেবে দেখলাম, দেশের মানুষ কাজ না করে কথা বলে বেশি। আর তাই আপনার কাছে নালিশও আসে বেশি। বুদ্ধি করে যদি কথা বলাটা বন্ধ করে দেয়া যায় তবেই কেল্লা ফতে।

হবু, গবু, পচু ঃ কথা বন্ধ করে দেব !

গোপাল ঃ ঠিক তেমন না। মানে কমন ভাষাটাকে বন্ধ করা গেলেই হলো।

হবু ঃ খুলে বল গোপাল, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।

গোপাল ঃ খুব সহজ। ঐ যে আমাদের ভাষা – ইটা, বিটা, কিটা।

হবু ঃ নেটা, নুটা, হিটা।

গবু ঃ ঘুটা, মুটা, টুটা।

পচু ঃ হটা, হাটা, বিটা।

গোপাল ঃ এইতো হলো। আমরা মায়ের ভাষা বাংলাটাকে বন্ধ করে ‘কব্জি ভাষা’ চালু করবো। এতে বেশির ভাগ মানুষই এই ভাষায় কথা বলতে পারবেনা। যার ফলে আর এত্ত দরবার-শালিশও হবে না। এত্ত বিধানও দিতে হবে না।

হবু ঃ চমৎকার ! চমৎকার !

গবু ঃ গোপাল, তোমার বিধানের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া উচিৎ।

পচু ঃ এতদিন পর গোপাল একটা ভাল বুদ্ধি দিয়েছ।

হবু ঃ তাহলে এই সিদ্ধান্ত হলো যে, আজ থেকে আমার রাজ্যে আর কেউ বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারবে না। কথা যদি বলতে হয় তবে আমাদের কব্জি ভাষায় কথা বলতে হবে।

(দৌঁড়ে তিন প্রহরী মঞ্চের সামনে চলে আসবে)

প্রহরী ১ ঃ এবার কি হবে আমাদের। আমরা তো কব্জি ভাষা বুঝিনা।

প্রহরী ৩ ঃ আর বোধহয় আমাদের বাঁচা গেলোনা।

প্রহরী ২ ঃ দিন দিন রাজা মন্ত্রী আর নায়েবসহ গোপালের ভার বেড়েই চলেছে। তাদের খেয়াল খুশিমতো রাজ্য চালাচ্ছে। বাংলার মানুষ তাদের খেয়াল খুশির পুতুল। অবশেষে আমাদের মায়ের ভাষাটাও কেড়ে নিল।

প্রহরী ১ ঃ আমরা আর তাহলে মাকে ডাকতে পারবো না।

প্রহরী ৩ ঃ রাজা আমাদের মুখের ভাষাটাও কেড়ে নিল দুষ্ট গোপালের কথায়।

প্রহরী ২ ঃ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। আমরা প্রজাতন্ত্রের আসল প্রহরী। আমাদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। সাধারণ প্রজাদের জন্য কিছু করার সময় এলো বুঝি। যাক, আপাতত প্রাণ বাঁচানোর জন্য একটা নতুন বুদ্ধি বের করেছি। রাজা যখন কব্জি ভাষায় কথা বলবে বা অন্য কোন প্রশ্ন করবে তখন আমরা বিদ্‌ঘুটে শব্দ করবো। রাজা বুঝতে না পেরে অবশ্যই বাংলা বলতে বাধ্য হবেন। তখই সব ব্যবস্থা করা যাবে। এখন চল দরবারে যাই।

হবু ঃ তাহলে শাহী এলান জারী করে দেই কেমন?

গোপাল ঃ নিশ্চয়ই।

হবু ঃ এলান দিয়ে দাও। (এলান)

হবু ঃ কচু মচু চচু।

গবু ঃ হারি মারি টারি।

পচু ঃ নিচু মিচু চিচু।

গোপাল ঃ গোল্লা মেল্লা চেল্লা।

হবু গবু পচু ঃ ডাডি মাডি বাডি।

হবু ঃ (প্রহরীদের দিকে চেয়ে) টিং টুং কুং।

প্রহরী ১ ঃ গ – র – র– র –

হবু ঃ ঝিং ঝাং নাং।

প্রহরী ২ ঃ ভট – ভট - ভট – ভটু ভট –

হবু ঃ বাটা মাটা ঘাটা।

প্রহরী ৩ ঃ ভুঁ – ভুঁ – ভুঁ – ভুঁ – ভুঁ –

হবু ঃ কি হচ্ছে এসব গবু পচু গোপাল? এই নালায়েকরা কি আমার কথা বুঝতে পারছে না?

গোপাল ঃ হিং চিং ফট।

হবু ঃ রাখ তোমার ফট। বাংলা বল।

গোপাল ঃ প্রহরীরা, তোমরা এসব কি বলছ?

প্রহরী ১ ঃ আমরা বিশুদ্ধ কব্জি ভাষা বলছি।

প্রহরী ২ ঃ আমাদের কাছে মনে হলো আপনাদের ভাষায় কোন গলদ আছে।

প্রহরী ৩ ঃ আমদেরত কোন ভুল হয় নাই জাঁহাপনা। বরং –

পচু ঃ কত বড় দুঃসাহস। বলে কিনা আমাদের ভাষা ভুল।

(বাইরে গোলযোগ – মিছিল, রাষ্ট্র ভাষা- বাংলা চাই। রাষ্ট্র ভাষা-বাংলা চাই। হবু রাজার কব্জি ভাষা- মানিনা, মানিনা)

গবু ঃ বাইরে এত গোলযোগ কেন?

পচু ঃ আমারতো ভয় করছে ক্যাশ বাক্সটা ছিনতাই হয় কিনা।
গোপাল ঃ মনে হয় বাংলা ভাষার দাবীতে প্রজারা বিদ্রোহ করেছে।

হবু ঃ বিদ্রোহ! প্রহরী –গোলন্দাজ বাহিনীকে বল বিদ্রোহ দমন করতে।

গোপাল ঃ ঠিক সিদ্ধান্ত। হবু রাজার নামে নিন্দা। শালাদের তোপের মুখে ফেলে দিন হুজুর। (আতংকিত প্রহরীদের প্রবেশ)

প্রহরী ১ ঃ হুজুর দুঃসংবাদ। বাংলা ভাষার দাবীতে মিছিলরত হাজার হাজার জনগণ হেরেমের দিকে ছুটে আসছে। ইতিমধ্যে গোলন্দাজ বাহিনীর হাতে পাঁচজন শহীদ হয়েছে।

হবু ঃ বল কি এসব ! হেরেমের দিকে ছুটে আসছে।

প্রহরী ২ ঃ শুধু তাই নয়, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রাসাদ গুড়িয়ে দিতে আসছে।

প্রহরী ৩ ঃ আমাদের সৈন্যদের চল্লিশগুণ বেশি মানুষ আক্রমন করতে আসছে রাজা বাহাদুর।

গবু ঃ হুজুর, একটা বিধান বের করেন অন্তত জনগণের হাতে মার খাবার আগে।

পচু ঃ (বাক্স হাতে নিয়ে) রাজা বাহাদুর, তাড়াতাড়ি বিধান দিন নয়ত ক্যাশ বাক্স নিয়ে আমি পালালাম।

হবু ঃ গোপাল, তোমার একমাত্র বিধান জারি করে আজ বুঝি প্রাণটা দিতে হলো। যদি পার শেষবারের মতো একটা বিধান দাও।

গোপাল ঃ বিধানত আছেই হাতে, মাত্র একটা এলান দিয়ে দিলেই দেখবেন কেমন করে সবাই যার যার মতো কেটে পড়ে।

হবু ঃ তা হলে দ্রম্নত বল বিধানটা কি।
গোপাল ঃ এখনি তাদের দাবী মেনে নিয়ে এলান দিয়ে দিন যে, প্রজাদের দাবীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ‘কব্জি’ ভাষা বাতিল করে বাংলাকেই রাষ্ট্র ভাষা করা হলো।

পচু ঃ ঠিক ঠিক ঠিক।

গবু ঃ হ্যাঁ জাঁহাপনা, পিঠের চামড়া বাঁচাতে হলে এখনই এলান করুন। (এ-লা-ন)

হবু ঃ উহ্। কি একটা ফাড়া গেলো। এতক্ষণে শান্তি লাগছে।
গবু ঃ খুব আরাম লাগছে হুজুর। তবে গোপালের পরামর্শে একটা বিপদেই পড়েছিলাম।

পচু ঃ কিন্তু বাঁচালোতো এই গোপালই।

হবু ঃ ঠিক বলেছ। তা গোপাল, শেষবারের মতো এমন একটা বিধান বের কর যাতে আমাদের কথা কম বলা হবে কিন্তু কাজ করা হবে বেশি।

গোপাল ঃ তৈরী হয়ে আছে হুজুর। গোপালের এই বিধানটাই শেষ।

হবু পচু ঃ তা কি বিধান গোপাল?

গোপাল ঃ এটা হলো স্যাটেলাইটের যুগ। একটা রিমোট আর একটা টিপ। ব্যাস–সব শেষ। এই যে, প্রহরী, এলান জারী, গোলন্দাজ বাহিনী এসব কিছুই লাগবেনা। শুধু একটা টিপ।

হবু ঃ তার মানে?

গোপাল ঃ আমরা একটা স্যাটেলাইট টিভি চালু করবো। এই টিভি শুধু আমাদের মানে হবু রাজার ভাষণ দেখাবে লাইভ মানে সরাসরি। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখবে হবু রাজাকে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সাড়ে তেইশ ঘন্টাই দেখাবে শুধু হবু রাজার মুখ। বাকী আধা ঘন্টা নাচ গান।

গবু পচু > আমাদের দেখাবে না?

গোপাল ঃ আরে, হবু রাজা মানেইত গবু মন্ত্রী, নায়েব পচু আর এই অধম গোপাল ভার।

হবু ঃ তোমার কথা শুনে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে গোপাল।

গোপাল ঃ শুধু তাই নয়, এই টিভির নাম হবে রাজা বাহাদুরের নামের অদ্যাক্ষর দিয়ে।

গবু পচু ঃ আমাদের নামের অদ্যাক্ষর কি এর সাথে সংযুক্ত করা যাবে না।

গোপাল ঃ অবশ্যই যাবে। রাজা বাহাদুর যদি রাজী হন।

হবু ঃ আমি রাজি। শুধু গবু আর পচু কেন গোপালের নামের অদ্যাক্ষরও থাকবে এর সাথে।

গবু পচু গোপাল ঃ হবু রাজা কি জয়।

হবু ঃ তাহলে আমাদের টেলিভিশনের নাম কি দাঁড়ালো – হবুর 'হ' - গবুর 'গ'- পচুর 'চ' আর গোপালের 'গো'। মানে হলো – "হগপগো"। চমৎকার আনকমন নাম। "হগপগো টেলিভিশন"।

গবু ঃ এই টিভির কোন শ্লোগান থাকবেনা ?

গোপাল ঃ অবশ্যই শ্লোগান থাকবে। "হগপগো টেলিভিষণ – কথা বলে হবু গবু পচু আর গোপালের"

পচু ঃ লা-জবাব। তা গোপাল, প্রহরীদের মুক্ত করার ব্যাপারে জানি কি বলছিলে?

গোপাল ঃ স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই আমরা পারমানবিক বোমা ফিট করবো। যখনই বিপদ তখনই রাজা বাহাদুর রিমোট টিপবেন, ডাণ্ডি পটাশ। অন্য কোন মানুষের প্রয়োজন নেই- শুধুমাত্র রাজা বাহাদুর ছাড়া।

(প্রহরীদের প্রস্থান)

হবু ঃ আচ্ছা গোপাল, ঐ যে হগপগো টেলিভিষণ হবে – ঐটার আধা ঘন্টার যে নাচ-গান দেখানো হবে, সেই নাচ-গানে কি শাহাজাদী গুলবাহার আর তোমাদের রাণীমা নাচ-গান করতে পারবে না।

গবু ঃ কেন পারবেনা?

পচু ঃ তাহলেত ভালই হলো, হগপগো টেলিভিষণ চব্বিশ ঘন্টা আমাদেরই টেলিভিশন হবে।

হবু ঃ যা বলেছ পচু।

(জনগণ সাথে নিয়ে ১ ২ ৩ প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী ২ ঃ প্রিয় রাজ্যবাসী, হবু চন্দ্রের রাজ সভার আমরা অতন্দ্র প্রহরী। তার অর্থ এই নয়, আজীবন অন্যায় আবদার মেনে নেব আমরা। প্রজাতন্ত্রের প্রহরী হিসাবে জনগণের পাশে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যথাসময়ে সাহায্য, সহযোগিতা ও বিশেষ অবস্থা জারি করাও আমাদের কর্তব্য।

প্রহরী ১ ঃ শুধু তাই নয়, জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে হবু রাজার দুঃশাসন প্রতিরোধ ও আপনাদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

প্রহরী ৩ ঃ সবাই মনে করে আমরা হবু রাজা আর গবু মন্ত্রীর চাকর। কিন্তু না, আমরা জনগণের চাকর। চাকরিতে যোগদান করেছি কেবলমাত্র জনগণের সেবা করবো বলে।

প্রহরী ২ ঃ তাই আমরা আপনাদের সমর্থন নিয়ে এই পাগল হবু, ছাগল গবু, ভেড়া গোপাল আর গাধা পচুর দুর্নীতির অবসান ঘটাতে চাই। আপনারা কি বলেন?

জনগণ ঃ জয়। আমরাত হবু রাজার ভয়ে মুখ খুলতে পারিনা। আমরা শান্তিতে বাস করতে চাই। আমরা রাজার অত্যাচারে অতিষ্ট। আপনারা এর একটা বিহিত করলে প্রাণে বেঁচে যাই।

প্রহরী ১ ঃ কেউ নেই জাঁহাপনা। আপনার ডাকে কেউ আর সাড়া দিবেনা।

পচু ঃ এসব কি বলছে ওরা !

প্রহরী ৩ ঃ তুমি চুপ কর।

প্রহরী ২ ঃ জনগণের সাথে ফাঁকি। জনগণের অর্থ আত্নসাৎ আর ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে আপনাদেরকে বন্দী করা হলো।

প্রহরী ২, প্রহরী ২ হবু গবু পচু ঃ কি? এত্ত বড় সাহস?

প্রহরী ১ প্রহরী ২ প্রহরী ৩ ঃ চুপ।

গোপাল ঃ ঠিক করেছ তোমরা। বাবা চণ্ডীদাসের কথার সাথে আমি একমত। চণ্ডীদাস কি জয়।

প্রহরী ২ ঃ তুমি ভেবেছ পার পেয়ে যাবে – তাইনা? তুমি শয়তানের গুড়ু, তোমারও বাঁচা নেই। দেশের এই ক্রান্তি লগ্নে বিশেষ আইনে তোমাদের বন্দী করা হলো।

হবু ঃ কি করছ এসব? আমাদের বন্দী করে কারাগারে পাঠালেতো সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে।

প্রহরী ১ ঃ সংবিধানের জন্য প্রজা নয়, প্রজার জন্য সংবিধান। আমরা এই বিশেষ সময়ে সুশীল সমাজ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে শাসন কাজ চালাবো – যতদিন নতুন রাজা নির্বাচিত না হয়।

প্রহরী ৩ ঃ রাজা মশায়, এটা ভাববেন না যে অন্যান্য রাজ্যের মত আমরা ক্ষমতা দখল করতে এসেছি। আমরা দেশের অতন্দ্র প্রহরী। দেশকে আন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করাই আমাদের কাজ।

প্রহরী ২ ঃ খুলে ফেলুন মুকুট। পোষাক রেখে দিন সিংহাসনে। যতদিন আপনাদের শুদ্ধতা ফিরে না আসবে ততদিন আর রাজ্য চালানোর কথা মাথায়ও আনবেন না। আজ থেকে শুরু হলো নতুন পথ চলা।

নিজের মেধাবী জীবনের সোনালি ভবিষ্যতের রাঙ্গা প্রভাতকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর রয়েছে আরও একাধিক গর্বিত পরিচয়।

ভাষা সৈনিক আব্দুল গফুরের উপর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার*

১৯৪৫ সাল।ফরিদপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে একজন ছাত্র বাংলা-আসামের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে এলাকাতে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালে আই এ পাশ করে অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্রটি পরবর্তীতে "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য" বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিন বছরের অনার্স কোর্স শেষ করলেও চূড়ান্ত পরীক্ষা আর দেয়া হয়নি তাঁর। কারণ, তখন তিনি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। যে আন্দোলনে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন সেটি কোন প্রথাগত রাজনৈতিক কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা কোন ছাত্র দাবী আদায়ের আন্দোলন নয়। বিশ্বে সম্পূর্ণ নতুন এক আন্দোলন ছিল সেটি। সেটি ছিল মুখের ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। বৃটিশদের তাড়ানোর পরপরই আরেকটি অপশক্তি পাকিস্তানী চক্র আমাদের মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা বাংলাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। তারই বিরুদ্ধে আন্দোলনে তখন জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি।
তিনি ভাষা সৈনিক আব্দুল গফুর।

নিজের মেধাবী জীবনের সোনালি ভবিষ্যতের রাঙ্গা প্রভাতকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর রয়েছে আরও একাধিক গর্বিত পরিচয়। তিনি ভাষা আন্দোলনের উদ্‌গাতা প্রতিষ্ঠান

---

* সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন নাসীমুল বারী, শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

'তমদ্দুন মজলিশ' এর দীর্ঘকালীন সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান সভাপতি। ভাষা আন্দোলনের নির্ভিক মুখপত্র 'সৈনিক' পত্রিকার সম্পাদক (প্রথমে সহকারী সম্পাদক)। ভাষা সৈনিক গড়ার নেপথ্য কারিগর আব্দুল গফুর। ভাষা আন্দোলনের জনক প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেমের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের একজন তিনি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বাংলাদেশের প্রথম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি), অধ্যাপক এ কে এম আহসান, অধ্যাপক শাহেদ আলী, অলি আহাদ, সানাউল্লাহ নূরী, শামসুল আলম, ডক্টর নুরুল হক ভূইঁয়া প্রমুখের সাথে তিনিও ছিলেন ভাষাযুদ্ধের প্রথম সেনানিবাসের একজন। তাঁদের সেদিনকার অকুতোভয় যুদ্ধ আর ঐকান্তিক মনোবলে আজ আমরা বাংলাভাষাকে নিয়ে এত গর্ব করতে পারি। আফ্রিকাসহ বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তেই আজ আমরা বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি। সেদিনের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত ফসলেই সৃষ্টি হয়েছে একুশ–একুশে ফেব্রুয়ারি; যা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটি গর্ব আমাদের।

"বাংলাভাষা ও সাহিত্য" শিক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রয়েছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"এর। "বাংলাভাষা ও সাহিত্যে" বাংলাদেশ তথা বিশ্বের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে এখানেই প্রথম চালু করা হয় পূর্ণাঙ্গ অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স। "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"এর এই উদ্যোগ আমাদের গর্ব। নতুন করে এই ইউনিভার্সিটি নিয়ে আমাদের আরও একটি গর্বের বিষয় হচ্ছে, এখান থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে "বাংলাভাষা ও সাহিত্য" বিষয়ক একটি "সাহিত্য পত্রিকা"। এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই একজন ভাষা সৈনিকের সাক্ষাৎকার প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে। এ জন্য ধন্যবাদ কর্তৃপক্ষকে।

ভাষা সৈনিক আব্দুল গফুরের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য যখন আমি নিজেকে প্রস্তুত করছি তখন আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছিলেন ভাষা আন্দোলনের জনক প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম, তাঁর একান্ত সহযোদ্ধা সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বাংলাদেশের প্রথম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি), অধ্যাপক এ কে এম আহসান, অধ্যাপক শাহেদ আলী, অলি আহাদ, সানাউল্লাহ নূরী, শামসুল আলম, ডক্টর নুরুল হক ভূইঁয়া প্রমুখের ছবি। কিন্তু তাঁরা আজ আর আমাদের মাঝে নেই। চলে গেছেন। অনেক দূরে। আমাদের জন্য গৌরবময় অতীত উপহার দিয়ে। আমরা আজ অঙ্গীকারবদ্ধ, তাঁরা আমাদের যা

দিয়ে গেছেন তাঁদের অনেক ত্যাগের বিনিময়ে, আমরা তার মান বজায় রাখবো আমাদের জীবন দিয়ে।

আব্দুল গফুর বর্তমানে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা " ইনকিলাব" এর ফিচার সম্পাদক পদে নিয়োজিত থেকে এখনও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে যাচ্ছেন। তাঁর কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল ঃ

ভাষা আন্দোলনে আপনাদের লক্ষ্যমাত্রা কি ছিল ?

আ ঃ গঃ ভাষা আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল তদানীন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্যেই সেদিন দাবী তোলা হয়েছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতের ভাষা এবং শিক্ষার বাহন করা। তবে অঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে অবশ্যই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মর্মবাণীর আলোকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে 'তমদ্দুন মজলিশ' কর্তৃক প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ?" এ লক্ষ্যেই নবগঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ করা হয়েছিল।

*আব্দুল গফুরের জন্ম **১৯২৯** সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তদানীন্তন ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার দাদপুর গ্রামে। আজ তিনি বয়সের ভারে ন্যূজ হলেও মনের দিক থেকে তরুণ। তাঁর কাছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ*

বাংলাভাষা আন্দোলনে আপনারা সফল হয়েছেন, কিন্তু বাংলাভাষার সার্বজনীনতা কি সফল হয়েছে?

আ ঃ গঃ বাংলাভাষা আন্দোলন সফল হলেও ভাষা আন্দোলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য যে আসেনি, এ এক করুণ সত্য। প্রথমত অফিস আদালতের অনেক স্তরে এখনও বাংলা ভাষার প্রচলন হয়নি। দ্বিতীয়ত এখনও বহু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা শিক্ষার বাহন নয়। আর্ন্তজাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে আপত্তি থাকার কথা নয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবী ভাষা শিক্ষাদানের একটা গুরুত্ব আছে। কিন্তু এসব কারণে বাংলাকে অফিস আদালতের ভাষা বা শিক্ষার বাহন করতে অসুবিধাটা কোথায়? এ এক সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ছাড়া বাংলাভাষাকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে ইংরেজি, আরবিসহ বিভিন্ন বিদেশী ভাষার শ্রেষ্ঠ গবেষণাধর্মী, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান গ্রন্থসহ সৃজনশীল সাহিত্যগ্রন্থ অনুবাদ করার কোন বিকল্প নেই। এ সত্যটা আমরা খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছি বলে মনে হয় না। এ কারণে ভাষা

আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী দেশে বাংলা ভাষার চর্চা ও সমৃদ্ধি বাঞ্চিত ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তমুদ্দুন মজলিশ "সাপ্তাহিক সৈনিক" নামে পত্রিকা প্রকাশ করে। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ১৪ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক শাহেদ আলী। প্রথমদিকে আব্দুল গফুর তাতে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। সৈনিকের পূর্বে তিনি জিন্দেগী পত্রিকাতেও কাজ করেছেন। তাঁর কাছে আমার তৃতীয় প্রশ্ন ছিল ঃ

"এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"– বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে প্রথম 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যে'র উপর পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু করে। 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যে'র সাথে আপনার নিবিড় সম্পর্ক। এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কি ?

আ ঃ গঃ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যে'র উপর পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু করে "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ" জাতির প্রতি এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। এ জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিনন্দন পাবার দাবীদার। এ উদ্যোগকে সার্থক করে তুলতে এখন তাদের সর্বাঙ্গ সুন্দর সিলেবাস প্রণয়নে হাত দিতে হবে। হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির সংস্কৃতি যার কবিতা ও গানে সমান সার্থকতার সাথে উঠে এসেছে, আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম অসাম্প্রদায়িক রূপকার সাহিত্যক্ষেত্রে সাম্য-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন কণ্ঠস্বর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে অধ্যয়ন না করেও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "বাংলাভাষা ও সাহিত্য" বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রীর সিলেবাস প্রণয়নের লজ্জা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে পারে "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ" এর মাস্টার্স ডিগ্রীর সিলেবাস। এ বিষয়টি জাতির জন্য যেমন ভাল দিক তেমনি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনুকরণীয় হিসেবে কাজ করতে পারে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের উপর আব্দুল গফুরের সম্পাদনায় 'সৈনিক' বিশেষ সংখ্যা জনমনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। সংখ্যাটি বের হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। তৎকালীন সরকার এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। রাতে হামলা চালিয়েছিল ভাষা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ও সৈনিক অফিস ১৯' আজিমপুর রোডে। প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাশেম ও আব্দুল গফুর পেছনের দেয়াল টপকে পালিয়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়ায় মাসাধিককাল আত্মগোপন করেছিলেন। সেই অকুতোভয় ভাষা সৈনিক আব্দুল গফুরের কাছে আমার চতুর্থ প্রশ্নঃ

"প্রথম কাতারের ভাষাযোদ্ধা, নাকি লেখক সম্পাদক হিসেবে প্রথম কাতারের ভাষাসেবক"– কোনটাকে অগ্রাধিকার দেবেন আপনি আজ?

আ ঃ গঃ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একজন ভক্ত হিসেবে আমি এ দু'টোর মধ্যে কোন সংঘাত বা অগ্রাধিকার রয়েছে বলে মনে করি না।

তিনি ১৯৫৬ সালে পুনরায় জগন্নাথ কলেজে (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) নৈশ বিভাগে বি এ ভর্তি হয়ে ১৯৫৮ সালে পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাশে ভর্তি হন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে। একই সময়ে সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন "মিল্লাত" পত্রিকায়। এ সময় কিছুদিন 'নাজাত' পত্রিকারও সহ-সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর কাছে পঞ্চম প্রশ্ন ঃ

বর্তমানে যে বিপুল সাহিত্য (উপন্যাস, গল্প, নাটক) রচিত এবং প্রকাশিত হচ্ছে তা সমাজ গঠনে কতটুকু ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন।

আ ঃ গঃ শিল্প সাহিত্য যে কোন জাতির জাগরণে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। সাহিত্যের মধ্যে আবার কথাসাহিত্যের কদর থাকে ছেলে, বুড়ো, নারী, পুরুষ সবার কাছে। গল্পে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জীবনের খণ্ডচিত্র প্রকাশ পায়। আর উপন্যাসের বৃহত্তর ক্যানভাসে সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। সমাজ পরিবর্তনে ও সুস্থ সমাজ গঠনে সাহিত্য বিরাট অবদান রাখতে পারে যদি পাঠক মনে কাঙ্খিত আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই কাঙ্খিত আবেদন সৃষ্টি নির্ভর করে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্ব-বিরোধিতার সঠিক সনাক্তকরণে। এবং তার নান্দনিক চিত্রণে সংশ্লিষ্ট লেখকের মুন্সিয়ানার উপর। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচুর গল্প, উপন্যাস, নাটক রচিত ও প্রকাশিত হলেও তা সমাজ গঠনে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারছে না প্রধানত সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতার কারণে।

আমাদের দেশে প্রতিভাশালী কথা সাহিত্যিক নেই তা নয়। কিন্তু সামাজিক অঙ্গীকার ও মহৎ জীবনবোধের অভাবে প্রতিভাশালী কথা সাহিত্যিকদের সৃষ্টি সম্ভারও সুস্থ সমাজ গঠনে ভূমিকা পালনে কিভাবে ব্যর্থ হয়, তার একান্ত প্রমাণ রয়েছে আমাদের দেশে। "জীবনের জন্য শিল্প ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য শিল্প"– এ দর্শনের পরিবর্তে আমাদের প্রতিভাশালী কথাসাহিত্যিকগণ চালিত হচ্ছেন 'আর্টস ফর আর্টস' তথা আনন্দের জন্য শিল্প ও সাহিত্য এই দর্শনের দ্বারা। ফলে তারা সস্তা পাঠক প্রিয়তা পাচ্ছেন প্রচুর, অর্থও আয় করছেন প্রচুর, কিন্তু সমাজ পরিবর্তনে কোন ভূমিকাই রাখতে পারছেন না অধিকাংশ কথাশিল্পী। অল্প কয়েকজন ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমাদের অধিকাংশ কথাসাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাসে শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের চিত্রই ফুটে উঠে। এদের গল্প-উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের কৃষক, তাতী, জেলে, ক্ষেতমজুর এবং শহরের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন বস্তিবাসী, ফুটপাত বাসীদের জীবনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার চিত্র অনিবার্য্য ভাবেই অনুপস্থিত থাকে। অথচ এরাই দেশের জনসংখ্যার পঁচাশি ভাগ। এই যে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আনন্দ-বেদনা, বোধ-বিশ্বাস ও জীবন সংগ্রাম বিবর্জিত সাহিত্য তার

পক্ষে সুস্থ সমাজ গঠন বা সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে পাঠক মনে কাঙ্খিত আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হবার কথা নয়।

আমাদের কথাশিল্পীদের সৃষ্ট সাহিত্যে আমাদের ২১৪ বছরের গৌরবজনক স্বাধীনতা সংগ্রাম খুব কমই চিত্রিত হয়েছে। এর কারণ সঠিক ইতিহাস চেতনার অভাব। যেন পলাশীর পর একাত্তুরের আগে আর কোন ঘটনাই ঘটেনি এদেশে। একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যই অনেক বড় মানের চূড়ান্ত ঘটনা। কিন্তু একাত্তুর যে ভূখণ্ডটিকে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিচিত করে তুলেছে, সে ভূখণ্ডটি কি এভাবেই ছিল ১৯৫৭ সালে? নিশ্চয়ই না। কিভাবে, কবে, কোন ঘটনার মাধ্যমে অখণ্ড ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ববঙ্গকে প্রদেশে পরিণত করা হয়েছিল, তার জন্যও প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছিল আমাদের পূর্বসূরীদের। সে সংগ্রামের কথা আমাদের কথাসাহিত্যে নেই। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পলাশীর পর দীর্ঘ একুশ বছর প্রধানত মুসলমানরাই সশস্ত্র সংগ্রাম চালায় ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা ফিরে পাবার লক্ষ্যে। ১৮৫৭ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত এই ৬৮ বছর মাত্র আমাদের পূর্বসূরীরা ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেদেরকে পারদর্শী করে তোলার প্রয়োজনে। ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামের স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্ট হওয়ায় দীর্ঘ অবহেলিত পূর্ববঙ্গের উন্নতির কিঞ্চিত সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় পূর্ববঙ্গের কলকাতামুখী জমিদাররা জমিদারীতে তাদের প্রভাব হ্রাসের আশংকায় ১৪৮ বছর পর সর্বপ্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বঙ্গমাতা ব্যবচ্ছেদের নামে আন্দোলন শুরু করে দেয়। তাদের বিশৃংখল সংগ্রামে মাত্র ৬ বছরের মাথায় বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ সম্পন্ন করলে "জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভাগ্য বিধাতা" বলে সম্রাট পঞ্চম জর্জের স্তুতিবাদে উন্মত্ত হয়ে উঠে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের লোকেরা। বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তাদের মায়াকান্না যে আসলে ছিল কুম্ভিরাশ্রম তার প্রমাণ মিলল তিন দশক পরে ১৯৪৭ সালে, যখন তাদের উত্তরসূরীরা ঘোষণা করল ভারত ভাগ না হলেও বাংলা ভাগ হতেই হবে।

বঙ্গভঙ্গ রদের পর একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা, বেঙ্গল এক্টের বিরোধিতা প্রভৃতি ঘটনার পরই ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের আজকের স্বাধীনতার রূপরেখা আমরা লাভ করি। এই লাহোর প্রস্তাবের একাংশ সাতচল্লিশে নিয়মতান্ত্রিক পথে বাকী অংশ একাত্তুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের রয়েছে সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস।

আমাদের কথাসাহিত্যে আমাদের স্বাধীনতা সংগামের সে ইতিহাস কমই চিত্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার পর ফারাক্কা বাঁধ, বঙ্গভূমি চক্রান্ত, নব্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রূপী সাম্রাজ্যবাদী মদদপুষ্ট এন জি ও নেটওয়ার্ক, প্রাকৃতিক সম্পদ

তেল-গ্যাসের উপর বিদেশী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী চক্রান্তের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রস্বত্তাকে যে পঙ্গু অর্থহীন করে তোলার চক্রান্ত সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছে তার চিত্র কতটা ফুটে উঠেছে আমাদের কথাসাহিত্যে? কথাসাহিত্যের পাশাপাশি আমাদের নাটক ও চলচ্চিত্রেও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক চিত্র যেমন অনুপস্থিত, তেমনি অনুপস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্রস্বত্তা পঙ্গু ও অর্থহীন করে তোলার সুপরিকল্পিত চক্রান্তের চিত্র।

'ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে' ভর্তি হয়েও বছরখানেক পড়াশুনা করার পর আব্দুল গফুরের আর এ বিষয়ে পড়াশুনা শেষ করা হয় নি। পরে ১৯৬২ সালে সমাজ কল্যাণে এম এ পাশ করেন। তাঁর কাছে ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ

ভাষা আন্দোলন বলতে বর্তমান প্রজন্ম পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে সর্বত্রই জেনে আসছে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে। এটি তো ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ এবং প্রকৃত রূপ নয়–চূড়ান্ত ফল মাত্র। নতুন প্রজন্মকে ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস জানানোর দায়িত্ব কার? তাতে আপনাদের ভূমিকা কি ?

আ ঃ গঃ; ভাষা আন্দোলনের সূচনা সাতচল্লিশে, আটচল্লিশের **১১**ই মার্চ তার প্রথম বিস্ফোরণ আর চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানানোর দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের, বিশেষত বাংলা একাডেমীর। মন্ত্রণালয় যদি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমাদের আর কিইবা করার রয়েছে। আমরা আমাদের সীমিত সামর্থের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এম এ পাশ করে 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজার' হিসেবে চট্টগ্রামে একবছর চাকুরী করেন আব্দুল গফুর। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজেও অধ্যাপনা করেছেন কিছুদিন। এরপর ঢাকার আবুজর গিফারী কলেজের সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। তাঁকে সপ্তম প্রশ্ন করি ঃ

এ শতকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উত্তরণের প্রধান মৌলিক দিক কোনটি আপনার দৃষ্টিতে?

আ ঃ গঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাধকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। শিল্প সাহিত্যের সমস্তসৃষ্টি, ইতিহাস, গবেষণা, অন্যান্য ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির বাংলা অনুবাদ, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস, গণমানুষের জীবন সংগ্রামভিত্তিক গল্প-উপন্যাস, কাব্য, নাটক, সংগীত, চলচ্চিত্র সৃষ্টি মোটকথা শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় জীবনমুখী সৃষ্টি, মননশীল প্রবন্ধ, জাতীয় বীরদের

জীবনচরিত রচনা, শিশুতোষ সাহিত্য, শিক্ষার সকল স্তরে, সকল বিভাগে মাতৃভাষায় পাঠদানের উপযোগী উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সৃজনশীল শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে উৎসাহদানের লক্ষ্যে পুরস্কার দানের সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সমাজের কাছে আমাদের প্রত্যেকের অশেষ ঋণ রয়েছে। যাদের মধ্যে বিধাতা শিল্প-সাহিত্যের প্রতিভা দিয়েছেন। সমাজকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে তাদের শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির সাধনার মাধ্যমে সমাজের প্রতি কাজ পরিশোধের পথে অগ্রসর হ'তে হবে।

অতঃপর তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে ঊর্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী করেন দীর্ঘ সময়। অবসর গ্রহণ শেষেও এ ভাষাকর্মী বসে থাকেন নি। জড়িয়ে পড়েন সংবাদপত্রের সাথে আবার নতুন করে। বর্তমানে তিনি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ইনকিলাবের ফিচার সম্পাদক। তাঁকে আমি অষ্টম প্রশ্ন করি ঃ

আপনি প্রথম কাতারের একজন ভাষা সৈনিক ; অথচ এ প্রজন্মের অনেকেই আপনাকে চেনেনা। কেন আপনারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন? – এ প্রজন্মকে এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

আ ঃ গঃ ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলাম বিবেকের তাগিদে, খ্যাতি লাভের জন্য নয়। নিজেকে আমি দূরে সরিয়েও রাখিনি আবার আগ বাড়িয়ে খ্যাতি লাভের আকাঙ্খায় আত্মপ্রচার চালানোর পক্ষপাতিও আমি নই। মানুষ হিসেবে জীবনে বহু ভুল-ভ্রান্তি করেছি, জীবন সায়াহ্নে এসে সবার কাছে শুধু একটু দোয়াই চাই, অতীতের সকল ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর ক্ষমা লাভে যেন ধন্য হই এবং বাকী জীবনটা যাতে সঠিক পথে চলতে পারি।

ভাষা আন্দোলনের উদগাতা প্রতিষ্ঠান 'তমদ্দুন মজলিশ' এর সাথে শুরু থেকেই জড়িত ছিলেন অধ্যাপক আব্দুল গফুর। এবং তিনি এর বর্তমান সভাপতি। আগেই বলেছি বয়সের ভারে ন্যূজ্ব হলেও মনের দিক থেকে এখনও তিনি তরুণ। তাঁর সাথে কথা বললে মনে হয়, তিনি যেন ১৯৪৮ সালের তারুণ্যের একজন হলেও এখনও সে সময়ের আবেগ এসে ভর করে তার মনে। এ যেন সময়ের মোহে আটকে থাকা ইচ্ছাগুলো। তাঁর কাছে আমার শেষ প্রশ্ন ছিল ঃ

এ প্রজন্মের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের প্রতি আপনার পরামর্শ ও উপদেশ কি?

আ ঃ গঃ এ প্রজন্মের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার আহ্বান তোমরা কখনো তোমাদের পঠন-পাঠন সিলেবাসের সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখবে না। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টের জন্য সিলেবাসের বিষয়বস্তুকে অবশ্যই বিশেষভাবে

গুরুত্ব দিতে হবে। ডিগ্রীর জন্য সিলেবাস অনুসরণের বাইরে বৃহত্তর জীবনে সিলেবাসের প্রয়োজনও মোটেও কম নয়। তাছাড়া, বাংলাভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিদেশী ভাষার বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদি পাঠেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এবং সে বিষয়ে গুরুত্ব দিবে।

ওরা জানতে পারে ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"-এ রয়েছে তাদের স্বপ্ন পুরণের সুযোগ। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে একমাত্র এখানেই রয়েছে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর পূর্ণাঙ্গ কোর্স। যা তারা চাকরী করেও সম্পন্ন করতে পারবে। কারণ, সাপ্তাহিক ছুটির দু'দিনই শুধু এখানে ক্লাশ হয় বাংলা বিভাগের।

এম আর সুমন*

আমাদের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

মফস্বল শহরের মধ্যবিত্ত দুই পরিবারের ছাত্র অপু ও দীপু। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে নিজ শহরের একটি কলেজ থেকে। বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করেছে ওরা। অপু ও দীপু দু'জনেরই ইচ্ছে এবার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হবে ওরা। ওরা দু'জনেই স্কুল জীবন থেকেই বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে লেখালেখি করে। লেখার হাত ভাল ওদের। তাছাড়া, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপরও বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে ওদের। ওদের দু'জনেরই ইচ্ছে এর উপরই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে ওরা। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী হওয়া কোনক্রমেই ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে দু'জনকেই একটি এন জি ও তে চাকরী করতে হচ্ছে। মোটামুটি সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর কোথাও অনার্স-মাস্টার্সসহ পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু নেই। মন ভেঙ্গে যায় ওদের। রাগ হয় ভীষণ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর। ওরা ভেবে পায় না, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বাদ দিয়েছে। ওদের ধারণা, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম লক্ষ্য হবে সে দেশের মূলবিষয় অর্থাৎ ভাষা ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরী করা। তারপর এর পাশাপাশি অন্যসব

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

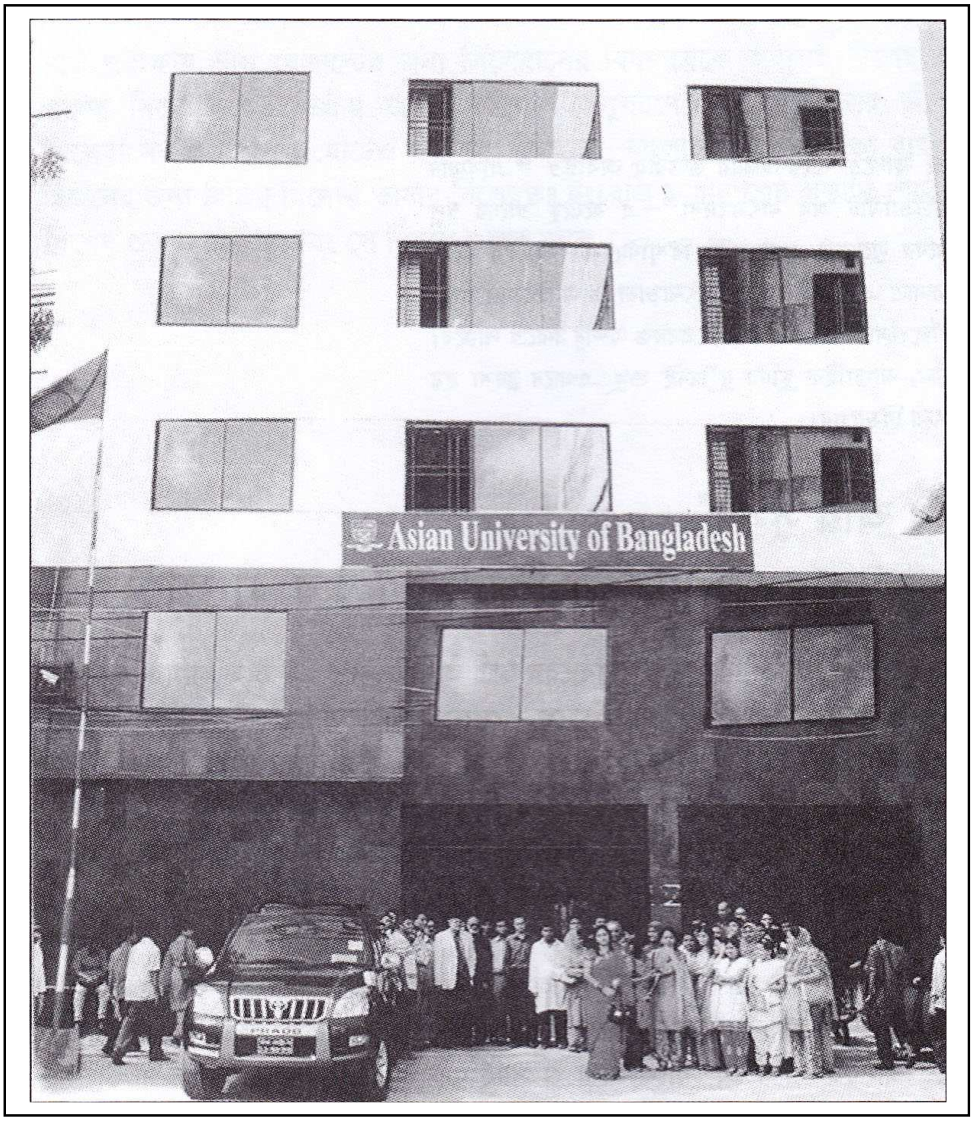

বিভিন্ন বিষয় চালু করা। অবশেষে হঠাৎ একদিন মুখে হাসি ফুটে ওদের। ঢাকায় অবস্থানরত এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে ওরা জানতে পারে ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"-এ রয়েছে তাদের স্বপ্ন পুরণের সুযোগ। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে একমাত্র এখানেই রয়েছে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর পূর্ণাঙ্গ কোর্স। যা তারা চাকরী করেও সম্পন্ন করতে পারবে। কারণ, সাপ্তাহিক ছুটির দু'দিনই শুধু এখানে ক্লাশ হয় বাংলা বিভাগের। এখানে বাজারমুখী বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপরও পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু রয়েছে। এবং এসব বিষয়েরও ক্লাশ হয় সাপ্তাহিক ছুটির দু'দিন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এমন সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপে মন ভরে যায় ওদের।

দু'বন্ধু ছুটে আসে "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"এর ক্যাম্পাসে খোঁজ খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে। ক্যাম্পাসের বিশ্ববিদ্যালয়সুলভ পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয় তারা। যেখানে ঢাকা শহরের অন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ অভিজাত মার্কেটের মধ্যে অবস্থিত যা বাইরে থেকে বুঝা যায়না এটি কি মার্কেট নাকি বিশ্ববিদ্যালয়। একই ভবনে শিক্ষা এবং একাডেমিক কার্যক্রম দুই-ই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ব্যতিক্রম। এখানে প্রত্যেক বিভাগের ক্লাশ আলাদা আলাদা ভবনে এবং একাডেমিক কাজকর্মও সম্পূর্ণ আলাদা ভবনে সম্পন্ন হয়ে থাকে। মাননীয় উপাচার্যের অফিসও সম্পূর্ণ আলাদা ভবনে অবস্থিত। শিক্ষার খরচও তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে খুবই কম। স্বপ্ন পুরণের বাসনা নিয়ে দু'বন্ধু ভর্তি হয় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে।

মানসম্মত শিক্ষা ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে এবং দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠিকে উচ্চশিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ৪ই জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদনক্রমে যাত্রা শুরু করে "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"। এবং একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ২৯৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়। গত বছরে (২০০৮ সাল) এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একযুগ পূর্তি উৎসব পালন করা হয়। আর মাত্র এই একযুগের ব্যবধানে যার শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় পনের হাজারের অধিক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে বাজারমুখী (বিবিএ, এমবিএ ইত্যাদি) বিষয়ের পাশাপাশি আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি (বাংলা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপরও পড়ানো হয়ে থাকে। যা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে এক ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত। সুযোগ রয়েছে চাকুরীজীবী, ব্রেক অব স্টাডি এবং গৃহ-সংসারের কাজকর্ম করেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের।

দেশের ৫১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় এক-দশমাংশ অধ্যয়ন করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে টিউশন ফি কম হওয়ায় এবং তা মধ্যবিত্তদের নাগালের ভিতরে থাকায় মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভের আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত আজ "এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ"। এখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে এ পর্যন্ত বহু শিক্ষার্থী দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে কৃতিত্ব স্থাপন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির বর্তমানে উপাচার্যের দায়িত্বে রয়েছেন ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক। তিনি মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সাবেক ডীন ছিলেন। শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি কেমব্রীজের

ইন্টারন্যাশনাল বায়োগ্রাফিক সেন্টার কর্তৃক “ওহঃবৎহধঃরড়হধষ সধহ ড়ভ ঃযব ুবধৎ ২০০০-২০০১চ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছিলেন। মানসম্মত ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই পূর্ণকালীন এবং নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ বেশিরভাগই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রীধারী এবং মেধাস্থান অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করা হবে বলে ইতোমধ্যেই ব্যাপক আশার বাণী ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ সম্পর্কে মাননীয় উপাচার্যের অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই উদ্দেশ্যে আশুলিয়া মডেল টাউন এলাকায় ইতোমধ্যে ১৫ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। এই জমিতে প্রয়োজনীয় একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন। এখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের আবাসিক সু-ব্যবস্থা থাকবে।

রাজনীতি ও সেশনজটমুক্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে তিনটি সেমিস্টারে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়ে থাকে। স্প্রিং সেমিস্টার (জানুয়ারী–এপ্রিল), সামার সেমিস্টার (মে–আগস্ট) এবং ফল সেমিস্টার (সেপ্টেম্বর–ডিসেম্বর)। আন্ডার গ্রেজুয়েট পর্যায়ে যে বিষয়গুলো এখানে পড়ানো হয় সে বিষয়গুলো হচ্ছে, বি বি এ, বি এস সি (ইঞ্জিঃ) ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার, বি এস সি (অনার্স) ইন কম্পিউটার সায়েন্স, বি এ (অনার্স) ইন ইংরেজী, বি এ (অনার্স) ইন বাংলা, বিএ (অনার্স) ইন ইসলামিক স্টাডিজ, বি এ (অনার্স) ইন ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা, বি এস এস (অনার্স) ইন অর্থনীতি, বি এস এস (অনার্স) ইন সমাজ বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, বি এড। গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে রয়েছে এম বি এ, এম এ ইন বাংলা, এম এ ইন ইসলামিক স্টাডিজ, এম এ ইন ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা, এম এ ইন ইংরেজী, এম এস এস ইন অর্থনীতি,এম এস এস ইন সমাজ বিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান, এম এস এস ইন সরকার ও রাজনীতি, এম এস এস ইন তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা এবং এম এড।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। ফলে এখান থেকে অর্জিত ডিগ্রী সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে স্বীকৃত এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা অচওঈঝ কর্তৃক পূর্ণভাবে স্বীকৃত আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়। বিদেশেও স্বীকৃত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী। সুতরাং এখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে এবং চাকুরী করছে। বিশ্বের নামকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা চুক্তিও রয়েছে এই

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে। তন্মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, জর্দান, ইরান ইত্যাদি।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীদের পুরস্কার ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের নানান সুবিধা রয়েছে। যেমন, চ্যান্সেলর পুরস্কার; ভাইস চ্যান্সেলর পুরস্কার; ভাইস চ্যান্সেলর লিসট পুরস্কার; ডিনস লিসট পুরস্কার; গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বেতন মওকুপের ব্যবস্থা; শিক্ষা সহযোগী কার্যক্রমে বিজয়ীদের জন্য বৃত্তি এবং বেতন মওকুপের ব্যবস্থাপনা; বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা মূলকভাবে কয়েকটি বৃত্তি এবং আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের রয়েছে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পাঠাগার। যেখানে গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। মূল ভবনের ষষ্ঠতলায় এটি অবস্থিত। এখান থেকে পাঠ্যক্রম সম্মত বই সরবরাহ করা হয়ে থাকে শিক্ষার্থীদের। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের রয়েছে আলাদা আলাদা নিজস্ব পাঠাগার। তবে কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পর্কে বলা যায়, বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ পাঠাগার।

মাননীয় উপাচার্যের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কেন্দ্রীয় পাঠাগার নিয়ে ভবিষ্যতে তাঁর নতুন কোন পরিকল্পনা আছে কিনা। জবাবে তিনি জানালেন, স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারটি সম্পূর্ণ আলাদা ভবনে স্থাপন করা হবে। উত্তরায় জমি থাকলে অনেক আগেই এটি আলাদা ভবনে স্থাপন করা হতো। তিনি আরো জানান, আশুলিয়ায় স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের সময় সাথে সাথেই পাঠাগার ভবন নির্মাণ করা হবে।

বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের জন্য এখানে রয়েছে অত্যন্ত উন্নত এবং আধুনিক মানসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব। মাথাপিছু একটি কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে এই ল্যাবে। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ই-মেইল, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রত্যেকটি ক্লাশরুম ছাড়াও এখানে শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্র অত্যন্ত উন্নতমানের শিক্ষাপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এসব ছাড়াও শিক্ষা সংক্রান্ত আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য।

মাননীয় উপাচার্যের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি আর কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চান অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর স্বপ্ন আর কতদূর? জবাবে তিনি জানান, তাঁর স্বপ্নের এই প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি উন্নতির চরমশিখরে নিয়ে যেতে চান। শিক্ষাক্ষেত্রের সবগুলো দরোজা তিনি এখানে খুলে

দিতে চান। অর্থাৎ দেশের শিক্ষার্থীরা যেন তাদের পছন্দের যে কোন বিষয়ের উপর এখান থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তিনি চান এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ "সেন্টার অব এ্যাক্সিল্যান্স" হিসেবে দেখতে। বলেন, সেই লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করি অবশ্যই আমরা সফল হবো। মহান আল্লাহ আমাদের সহায়তা করবেন।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হলেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে এটির কোন মূল্য নেই। এক্ষেত্রে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ভূমিকা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, অত্যন্ত্য সাহসিকতাপূর্ণও। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এখানেই সর্বপ্রথম চালু করা হয় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর অনার্স ও মাস্টার্সসহ পূর্ণাঙ্গ কোর্স। আর্থিক দিক দিয়ে বিভাগটি অত্যন্ত অলাভজনক হওয়া সত্ত্বেও মাননীয় উপাচার্যের মাতৃভাষার প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবোধ থাকার কারণে ১৯৯৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রার শুরুর সময়েই এটি চালু করা হয়। বর্তমানে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। শুধুমাত্র সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অর্থাৎ শুক্রবার ও শনিবার এই দু'দিন এই বিভাগটির ক্লাশ করার সুযোগ থাকায় এটি এখন বাংলাভাষা ও সাহিত্য অনুরাগীদের কাছে উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও ব্রেক অব স্টাডি, চাকুরীজীবী এবং সংসারের ঝামেলায় পড়ে যারা উচ্চশিক্ষা লাভের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তারাও এখান থেকে সে সুযোগটি গ্রহণ করছেন অত্যন্ত্য তৃপ্তি সহকারে। একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলা বিভাগে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার, কর্মশালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদেরকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রতি সেমিস্টারে ভাষার উপর দক্ষতা উৎকর্ষের জন্য বানান ও উচ্চারণের উপর কর্মশালাসহ পিকনিক, নবীন বরণ, বিদায় অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এখানেও রয়েছে বিভাগের নিজস্ব পাঠাগার। শিক্ষকবৃন্দের অধিকাংশই উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত।

সবশেষে বলা যায়, আমাদের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার।

প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৮,
পৃষ্ঠা ৫৩১, মূল্য-২৮৪

হিদায়াতুল কুরআন–১ম খণ্ড*

ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

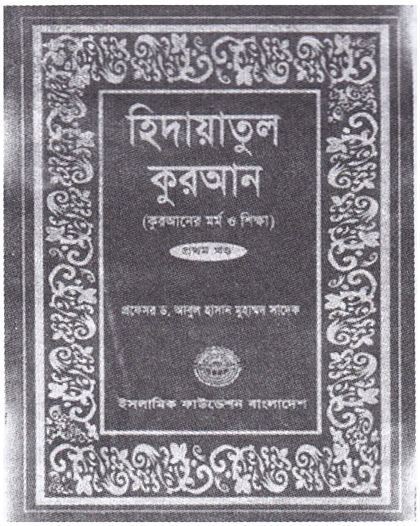

"হিদায়াতুল কুরআন" বাংলা ভাষায় রচিত একটি উল্লেখযাগ্য তাফসীর গ্রন্থ। একাধিক খণ্ডে প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির প্রকাশিত প্রথম খন্ডটির উপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হলো। তাফসীরটি রচনা করেছেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর ভাইস চ্যান্সেলর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক। লেখক শুধু ইসলামী গ্রন্থই রচনা করেননি; বরং অর্থনীতি বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও তিনি ইংরেজীতে লিখেছেন। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। তিনি মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির সাবেক ডীন ছিলেন। শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি কেমব্রীজের ইন্টারন্যাশনাল বায়োগ্রাফিক সেন্টার কর্তৃক "ওহঃবৎহধঃরড়হধষ সধহ ড়ভ ঃযব ুবধৎ ২০০০-২০০১চ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন ২০০০/২০০১ সালে। কোরআনের অন্তরঙ্গ বঙ্গাঁনুবাদ এবং আয়াতের প্রেক্ষাপটসহ বাস্তব জীবনের আলোকে কোরআনের মর্মদর্শন ও শিক্ষাকে তিনি যেভাবে তাঁর এ তাফসিরে উপস্থাপন করেছেন, তাতে বিশ্ববাসী একটি তাৎপর্যপূর্ণ তাফসির পেলো।

"হিদায়াতুল কুরআন" তাফসিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কুরআনের প্রতিটি আয়াতের মর্ম ও শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের উপযোগী করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। এখানে প্রতিটি আয়াতের প্রথমে সহজ বঙ্গানুবাদ তারপর 'টীকা' শিরোনামে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও তাফসীর এবং শেষে 'মর্ম ও শিক্ষা' মূল শিরোনামে আয়াতগুলোর উপর গভীর পর্যবেক্ষণমূলক সহজ বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক গভীর অধ্যয়ন ও অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর এ তাফসিরটি প্রণয়ন

* গ্রন্থালোচনা করেছেন ড. রহমান হাবিব। লেখক, গবেষক, প্রাবন্ধিক। সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত এ তাফসিরটির প্রথম খন্ডে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অনুবাদ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম খন্ডকে ভিত্তি করেই আমি আমার ক্ষুদ্র আলোচনা প্রচেষ্টা এখানে সম্পন্ন করেছি।

"সূরা ফাতিহা" হলো পবিত্র কুরআন শরীফের উপক্রমনিকা। এ সূরাকে কোরআনের জননী বলা হয়। সমস্ত কোরআনের সারমর্ম ও মূলশিক্ষা ও উদ্দেশ্যের দর্শন এই সূরায় রয়েছে। এই সূরায় জগত ও সৃষ্টির মহান পরিকল্পক যে আল্লাহ তায়ালা তা বিশেষভাবে স্পষ্টায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ প্রাণীজগত, উদ্ভিদজগৎ, পৃথিবী ও সৌরজগত সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করেই সমস্ত সৃষ্টি বিরাজমান রয়েছে। পুনরুত্থানের পর বিচার দিবসের তিনি মালিক। আমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট ও যারা হিদায়াত প্রাপ্ত, তাদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করার জন্য এই সূরায় আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি।

আল কোরআনেই (২:১৮৫) বলা হয়েছে যে, কোরআন হলো মানুষের জন্য হিদায়াত। হিদায়াত পাওয়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে। হিদায়াত তো স্বতস্ফুর্ত কোন বিষয় নয়। হিদায়াতের জন্য আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, নবী-রাসূলগণ, তকদীর, পরকাল, ও পুনরুত্থানের প্রতি গভীরতম বিশ্বাস থাকতে হবে। আল্লাহ নির্দেশিত সৎ পথে চলা এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ পথ ও কর্ম থেকে বিরত থাকার নাম হলো তাকওয়া যা খোদাভীতি। আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসার নিদর্শন বান্দার থাকতে হবে। সৎ পথ লাভ বা হিদায়াত প্রাপ্ত হবার জন্য মন থেকে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। অনেক নাস্তিক লোক আছেন, যারা কোরআন হাদীস সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছে; কিন্তু হিদায়াতের কোন মানসিক ইচ্ছা তাদের মনের মধ্যে কার্যকর থাকেনি বলে কোরআন ও হাদীস দ্বারা তাঁরা সৎপথ লাভ সমর্থ হয়নি।

হিদায়াত লাভের জন্য কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি মান্য করা অতীব জরুরী। আয়াতটি হলোঃ "যে ব্যক্তি রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করলো, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করলো" (কোরআন-৪:৮০)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের নবী ছিলেন যথাক্রমে মূসা (আঃ)। মুসলমানদের নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। বিশ্বনবী (সাঃ) এর উম্মত বা অনুসারীদের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে অনেক বেশি। নবী (সাঃ) কে ভালবাসলে এবং রাসুল (সাঃ) কে অনুসরণ করলে আল্লাহরই আনুগত্য করা হয় বলে কোরআনে উল্লেখিত আছে। সেজন্য নবী (সাঃ)কে ভালবাসার এবং রাসুল (সাঃ) এর আনুগত্য করাই হলো মুসলমানদের হিদায়াত লাভের প্রধান শর্ত।

পৃথিবীর অনেক জাতির ইতিহাস কোরআন শরীফে উল্লেখিত আছে। আদ, সামুদ, বনী ইসরাঈল–বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্যতম। অনেক জাতি ছিল পথভ্রষ্ট এবং কিছু কিছু জাতি ছিল হিদায়াতপাপ্ত। সূরা ফাতিহায় পৃথিবীর ইতিহাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, যারা পথভ্রষ্ট তাদের পথে নয়, বরং যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত তাদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করার জন্য।

সূরা বাকারায় অদৃশ্যে বিশ্বাস (আয়াত-৩) কে তাকওয়ার প্রথম শর্ত বলা হয়েছে। হিদায়াতের জন্য প্রয়োজন হলো তাকওয়া। হিদায়াত পাবার জন্য তাকওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হলো নামায কায়েম করা। কোরআনে রয়েছে, "নিঃসন্দেহে নামায (মানুষকে) অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে" (আল-কুরআনঃ ২৯:৪৫)। প্রকৃতির অবৈধ ও অন্যায় আধিপত্য থেকে রক্ষা পাবার জন্য নামায পড়তে হবে। যাদের নামায তাদেরকে প্রকৃতির পাপ থেকে রক্ষা করতে পারেনা তাদের নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় হয় না ও আল্লাহর দরবারে পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হয় না বলা যায়।

আল্লাহর পথে এবং দরিদ্রদের উদ্দেশ্যে অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করা হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়ার তৃতীয় শর্ত। যারা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)সহ ইসলামের মৌলিক আকিদায় বিশ্বাস করে, তাদের দ্বারা মানুষের অর্থনীতি স্বেচ্ছাচারীভাবে পরিচালিত হতে পারে না। ভোগ-বিলাস, অবৈধ নারী-সংসর্গ, মদ্যপান ও অশ্লীল কাজে তারা তাদের অর্থ ব্যয় করতে পারবেনা। মানবতার কল্যাণ ও দরিদ্র মানুষের সেবার জন্য অর্থ ব্যয় করা ঈমানদারদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

ইসলামী জীবন-দর্শনকে যারা অস্বীকার করে তারা হলো কাফির। যারা মুখে বলে, তারা ইসলামের অনুশাসন ও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বিশ্বাস করে, অথচ আসলে বিশ্বাস করে না তারা হলো মুনাফিক। কাফির ও মুনাফিকরা হিদায়াত পাবে না। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, পদার্থ, রসায়ন, দর্শন, অর্থনীতি–প্রভৃতি বিষয়ে কারো ব্যাপক জ্ঞান থাকলে তিনি যদি আল্লাহ, ফিরিস্তা, নবী-রাসূল, তকদীর, প্রেরিত আসমানী কিতাব, পরকাল ও মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন–তবেই তার জন্য হিদায়াত লাভ সম্ভব হবে এবং যদি তিনি মন থেকে সত্য পথ লাভের আকাঙ্খা পোষণ করেন, নইলে তার সমস্ত জ্ঞান সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা কিন্তু অনুধ্যানের (ওহঁঃরঃরড়হ) মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াবলী যে সত্য তা অবশ্যই বিশ্বাস করতে সমর্থ হবেন।

মুনাফিকরা কাফেরদের চেয়েও মারাত্মক নেতিবাচক ভূমিকা সমাজে পালন করে। এই হিপোক্রেটদের কথা ও কর্মে কোন মিল নেই। অধিকন্তু তারা সমাজ, রাষ্ট্র ও সংসারে শুধু ফ্যাসাদ বা বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করেনা; বরং তাদের প্রচারকে তারা সংস্কার হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়, যাতে সমাজের মানুষরা তাদের দ্বারা আরও বিভ্রান্ত

হয়। ইসলাম সোজা, সরল হিদায়াতের পথ পছন্দ করে। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে বলে। প্রতারণা, ধোকাবাজি, মিথ্যা ও হালকাভাবকে অপছন্দ করে। অথচ মুনাফিকদের বিশ্বাস ও কর্ম উভয়ই হালকা শুধু নয় প্রবল প্রতারণাব্যঞ্জক। সেজন্য মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।

যারা চেতনাহীন, অমনোযোগী ও অজ্ঞ এমন লোকদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ "তাদের হৃদয় মন আছে, কিন্তু তা ব্যবহার করে তারা বুঝতে চায় না; তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা ব্যবহার করে তারা দেখে না; তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শুনে না। এরা হলো পশুর মতো, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাই গাফেল বা চেতনাহীন"(কুরআন ৭:১৭৯)। আসলে সূরা ফাতিহায় যাদেরকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে, এরাই সেই বিভ্রান্ত পথযাত্রী।

মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি (সূরা বাকারা, আয়াত:৩০) হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর অস্তিত্বে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নবী রাসূলদের পথকে অনুসরণ করে আল্লাহর নির্দেশিত সৎ, সুন্দর ও কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হলো প্রতিনিধিদের কাজ। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর পর অন্য কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না। সেজন্য নবী (সাঃ)এর উম্মতগণ কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর খলিফার দায়িত্ব পালন করে যাবেন। এই দায়িত্ব আসলে নবীদেরই দায়িত্ব। এজন্য নবী (সাঃ)এর উম্মতদের বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বা সম্প্রদায়। নবী করীম (সাঃ) জ্ঞানকে অর্জন করা ফরয ঘোষণা করেছেন। সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি ও বিশ্বব্যবস্থাকে পরিচালিত করার জন্যে জ্ঞান প্রয়োজন বলেই নবী (সাঃ) ইসলামের জ্ঞানের প্রতি এত গুরুত্বারোপ করেছেন। তাহলেই খলিফার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে। ইসলাম অর্থ শুধু ব্যক্তিগতভাবে নামায ও নফল এবাদত করাই নয়। সামাজিক কর্তব্যও পালন করতে হবে। রোযা ফরয এবাদত। রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার্ত থাকার মাধ্যমে এটিকে বুঝতে হবে যে, ক্ষুধার্ত-দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষরা কত কষ্টে জীবন যাপন করে তা অনুধাবন করা। অবৈধ কামপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে সার্বক্ষণিক স্রষ্টার ধ্যানে পবিত্র অবস্থান থাকাও রোযার শিক্ষা। যাকাতের শিক্ষা হলো বঞ্চিত ও অভাবী মানুষদের স্বাচ্ছন্দ্য ও অভাবমুক্ত জীবন যাপনের জন্য ধনী মুসলমানরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং সম্ভব হলে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে তাদের জীবনকে স্বচ্ছলতায় নিয়ে আসবে। সেজন্য, যাকাত হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে জনদায়িত্ব পালন ও ইসলামের এবাদতের অন্তর্ভূক্ত।

অপরাধ মানুষের হয়ে যেতে পারে। কুরআনে মানুষকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রণোদিত করা হয়েছে। অপরাধ অবশ্যই ক্ষমার মাধ্যমে নিরসন করতে হবে। এক আল্লাহতে বিশ্বাস এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল, এই কালেমায় অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। এক আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে না মেনে আল্লাহর

সাথে কাউকে শরিক করলে সে শিরককারী হবে। শিরক আল্লাহ মাফ করবেন না। তবে তওবা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হলে আল্লাহ তা মাফ করবেন। অন্য কোন অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। "ক্ষমা পেতে আরো সহায়ক হয় যদি কোন অপরাধ হয়ে গেলে বেশি বেশি পূণ্য করা হয়"(আল কুরআন-১১:১১৪)।

আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে হলে ধৈর্য্য প্রয়োজন। নিষিদ্ধ জিনিস থেকে প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য ধৈর্য্য দরকার। আল্লাহর আদেশ পরিপূর্ণভাবে পান করার জন্য শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ধৈর্য্যধারণ করেই আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর প্রেমের পথে অগ্রসর হতে হয়।

স্মর্তব্য, বিনা রক্তপাতে মক্কাবিজয় মহানবী (সঃ)এর জীবনে এক অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। মক্কা বিজয়ের পর নবী (সঃ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আট রাকাআত নামায আদায় করেছেন এবং কাফির মুশরিকদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। এতে নবী (সঃ) বিজয়েও যে বিনয়ী ছিলেন, সেটিই স্পষ্ট হয়। প্রকৃত মুসলমান বিজয়েও বিনয়ী থাকেন। কুরআনে বলা হয়েছে, একটি মানুষকে কেউ অন্যায় ভাবে হত্যা করলে যেন সমস্ত মানুষ ও মানবতাকেই সে হত্যা করে ফেললো (কুরআন-৫:৩২)। হত্যার বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে কুরআনের এই বক্তব্য খুবই গভীরভাবে উপস্থাপিত। সেজন্য ইসলামে যে জঙ্গিপনা ও হত্যা চর্চা নেই তা স্পষ্ট করে বলা দরকার। "অপরাধী, অকৃতজ্ঞ ও অহংকারীদের আল্লাহ যেমন শাস্তি দেন, তেমনি তিনি নেক্কার, কৃতজ্ঞ ও বিনয়ীদের নিয়ামত বৃদ্ধি করেন" (আল-কুরআন-২:৫৮; ৭:১৬১; ১৪:৭)।

রাসূল (সঃ) এবং মুসলমানদের দায়িত্ব হলো মানুষদের সত্যপথে আসার জন্য আহব্বান করা। সত্যপথে নিয়ে আসা তাদের দায়িত্ব নয়। ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই-এটি সূরা বাকারায় রয়েছে। যিনি যত বেশি আকাঙ্খা পোষণ করবেন স্রষ্টার প্রেমে নিমজ্জিত হবার, তিনি ততটুকুই হিদায়াত প্রাপ্ত হবেন। দুনিয়ার কাজে সফল হতে হলে পরিশ্রম, জ্ঞান ও কর্মপ্রয়াস চালাতে হবে। কোন অবিশ্বাসীও চেষ্টা করলে বৈষয়িক ও জৈবনিক কাজে সফল হতে পারে। তবে দুনিয়ার নেতৃত্ব পেতে হলে নেতৃত্বের গুণাবলী, ত্যাগ, উপকরণাদি সংক্রান্ত প্রচেষ্টা, ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার প্রয়াস চালাতে হবে (আল-কুরআন-২:১৭৭; ২:১৪; ৮:৬০; ৩:১০৩)।

প্রকৃত খোদাপ্রেমিকরা এমন হবেন যে, "তাদের জীবন-মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। যেন এমন হয়ে যায় যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সেও আল্লাহকে পেয়ে সন্তুষ্ট" (আল-কুরআন ৬:১৬২; ৫:১১৯)। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সমর্পণশীল এবং নবী (সঃ)এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল ব্যক্তির পক্ষেই আল্লাহর প্রেমে ও ধ্যানে পরিপূর্ণভাবে মগ্ন হওয়া সম্ভব।

কুরআনে বলা হয়েছে, "মুসলমানদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, যদি তারা প্রকৃত মোমিন হয় এবং যথাযোগ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে" (আল-কুরআন-৩:১০৩; ৮:৬০)। আল্লাহর প্রতি পূর্ণবিশ্বাস রেখে যিনি সৎ, পাপমুক্ত ও নৈতিক জীবন যাপন করেন, তার পক্ষে দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। সাম্রাজ্যবাদী বা শাসকশ্রেণী বা কর্তাব্যক্তিদের রক্তচক্ষুকে ভয় করে অন্যায় করা যাবে না। সততা, সত্যনিষ্ঠা, নৈতিকতা রক্ষা করা এবং আল্লাহকে ভয় করে ধর্মবিরোধীদের প্রচেষ্টাকে যৌক্তিক ও মানবিকভাবে প্রতিহত করতে হবে (আল-কুরআন-বাকারা-১৫০)। কুরআনে বলা হয়েছে, যারা তাদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই"(আল-কুরআন-৬:১৫৯)। সেজন্য এটি স্পষ্ট যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ঐক্য অবশ্যকাম্য। সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণা করা খুব জরুরী। সেজন্য ইসলামে গভীর জ্ঞানচর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যাতে সুক্ষ্মভাবে কুরআন, হাদীস বুঝে ব্যক্তিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে ইসলামের বিধানকে মানবতামূলকভাবে ব্যবহার করা যায়।

কুরআনে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)এর চরিত্র হলো সর্বসুন্দর ও সর্বোত্তম। নবী (সঃ) পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য। সৎ, চরিত্রবান ব্যক্তিদের ইবাদত স্রষ্টার কাছে অধিক প্রিয়। কারণ, চরিত্রবান থাকাও তো একটি ইবাদত। মানুষ ব্যক্তিক ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হলে সমাজ সংসার সুন্দর হয়ে উঠবে।

স্বামী ও স্ত্রীকে একে অপরের ভূষণ বলে কুরআন সাব্যস্ত করায় নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসা ও দায়িত্ববোধের প্রগারতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজ বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হয়ে নৈতিকতাপূর্ণ জীবন যাপন করলে তাদের দাম্পত্য জীবন কল্যাণময় ও শান্তিময় হয়ে উঠবে।

সূরা বাকারার ২০৮ নম্বর আয়াতে ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার কথা নির্দেশিত হয়েছে। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইসলামের জ্ঞান ও বিধানগত ব্যবস্থায় পরিপূর্ণভাবে অনুপ্রবেশের কথাই এই আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে।

কর্মব্যস্ততার কারণে আসরের নামায যাতে আমাদের বাদ পড়ে না যায় সেজন্যই এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহর প্রতি সতত ইবাদতশীল থাকার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা থাকা দরকার। কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষ ও জ্বীনকে শুধুই আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সেজন্য নামাযের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ইবাদত, জিকিরের ও তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ইবাদত, যাকাতের মাধ্যমে সামাজিক

ও মানবিক দায়িত্ব এবং রোযার মাধ্যমে কু-প্রবৃত্তি হতে মুক্ত হয়ে সার্বক্ষণিক স্রষ্টার প্রেমে আমাদের মগ্ন থাকতে হবে।

অপ্রিয় জিনিসকে আল্লাহর পথে ব্যয় করলে সে প্রকৃত মুমিন নয়। জনদারিদ্র দূর করার জন্য এবং মানবতার কল্যাণের জন্য ও আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় জিনিস ব্যয় করতে হবে। নিম্নের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি প্রকৃত প্রেম প্রকাশের পথ অভিব্যক্ত। আয়াতটি হলো-"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করো" (কুরআন-৩:৯২)।

সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে তিনি ধর্মের গভীর জ্ঞান দান করেন। প্রকৃত জ্ঞানী হলেই আল্লাহর হক (হক্কুল্লাহ) ও বান্দার হক (হক্কুল এবাদ) আদায় করে মানুষ স্রষ্টাপ্রেম হাসিল করতে সমর্থ হবে।

স্মর্তব্য যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর যত আনুগত্য থাকবে এবং যত বেশি রাসূল (সঃ)কে অনুসরণ করে পাপমুক্ত, সৎ ও ইবাদতময় জীবন যাপন করবে, সে ততটুকুই আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ আশা করতে পারে। মনের চেতনায় যাতে পাপের বোধ ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো কাজ না করে, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। অচেতনভাবে মনের মধ্যে পাপচিন্তা আসতে পারে–সে ব্যাপারেও সর্তক থাকতে হবে। তাহলেই পরিপূর্ণ পাপমুক্ত থেকে সৎ ও মানবিক জীবন যাপন করে ইসলামের চর্চার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিক ও সামাজিক-রাষ্ট্রিক উভয় দিক থেকেই একজন মানুষ সফলতা পেতে পারবে। যে সাফল্য আসলে ইহকাল ও পরকাল উভয়ের জন্যই প্রয়োজ্য হবে।

সবশেষে বলা যায়, গবেষক ড. আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেক এই তাফসীর গ্রন্থটিতে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার অন্তর্নিহিত মর্মশিক্ষা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। যা ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত। সর্বোপরি মানুষের নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন চরিত্র গঠনের জন্য এই তাফসীর গ্রন্থটি পাঠ অবশ্য অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাফসির জগতে "হিদায়াতুল কুরআন" গ্রন্থটি পাঠক এবং গবেষক উভয়ের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ।